২৯ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● **নভেম্বর** ২০০৯

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	০২
লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি	অজানা চৌধুরি	০৪
গণপতি অসম্ভবকে সম্ভব করতেন!	সমীরকুমার ঘোষ	০৯
চার্লস্ ডারউইন- অনিচ্ছুক এক বিপ-বী	ইয়ান অ্যাঙ্গাস	১২
বিজ্ঞান ও নয়া সামন্ততন্ত্রের উত্থান	কিরণ কারনিক	১৪
যক্ষ্মা নিঃশব্দে বিছিয়ে চলেছে মৃত্যুজাল	শর্মিষ্ঠা দাস	১৬
ভিজিটিং আওয়ারের ভাল মন্দ	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৯
একুশে ফেব্রুয়ারি	পূরবী ঘোষ	২১
আয়লার (তি এবং (ত	ভবেশ দাস	২৩
জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৪	নিরাঞ্জন হালদার	২৬
বিজ্ঞানের দৌলতে বুড়োর দল বাড়ছে	অমিত সরকার	২৯

অক্ষর বিন্যাস : ঝিল্লি ব্যানার্জি, সুবীর ঘোষ ও স্বপন দত্ত

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ই-মেলঃ jhilly_banerjee@yahoo.co.in

ওয়েব সাইটঃ www.utsamanush.com

আমাদের কথা

উৎস মানুষ আবার বেরোচ্ছে। জুলাই সংখ্যা প্রকাশের পর ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সেই ভরসা থেকেই নভেম্বর সংখ্যা প্রকাশের দুঃসাহস। ‘নেই-নেই’-এর তালিকা এখনও দীর্ঘ। কিন্তু আমরা তার ফিরিস্তি তুলে ধরে পাঠককে বিব্রত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চাই না। রবীন্দ্রনাথের থেকে ধার করে বলতে হয়—‘বিপদে মোরে র(া করো এ নহে মোর প্রার্থনা—বিপদে আমি না যেন করি ভয়।’ আপনারা পাশে থাকুন।

জুলাই সংখ্যা নিয়ে পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রতিত্রি(য়া পাচ্ছি। কোনো লেখা পাঠ্যপুস্তকধর্মী হয়েছে, কোনোটায় স্বচ্ছতার অভাব—এমন অভিযোগও পেয়েছি। আর বানান ভুল তো রয়েইছে—এই সমালোচনা, মতামত ও পরামর্শ আরও আরও চাই। আমাদের চিঠি লিখে বা সরাসরি ভুল-ত্রুটি নিয়ে জানান। জানান আপনাদের বিষয়-ভাবনার কথাও, যা উঠে আসতে পারে পত্রিকার পাতায়। এই চিঠি-পরামর্শ-সমালোচনাই আমাদের দিগ্‌নির্দশক হবে। টলমল করতে করতে ঋজু পায়ে হাঁটব। এই স্বপ্ন নিয়েই আপাতত পথ চলা।

—সম্পাদকমণ্ডলী

অস্থায়ী কার্যালয় ও চিঠিপত্রে যোগাযোগ

ঝিল্লি ব্যানার্জি

খাদিমস্ বিদ্যাকুট আবাসন

বি - ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পো - (আর) গোপালপুর, কলকাতা-৭০০১৩৬

আহরণ

হোমিওপ্যাথি, ফলিতজ্যোতিষ ও ভূতদেখা

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

হোমিওপ্যাথির কথা উঠলে অ্যালোপ্যাথির ও কবিরাজীর কথা এসে যায়। অ্যালোপ্যাথি ডাক্ত(ার ও ওষুধে পৃথিবী ছেয়ে আছে। অ্যালোপ্যাথি বিজ্ঞানভিত্তিক। এর গবেষণায় সমস্ত উন্নত দেশে হাজার হাজার লোক কাজ করছে(লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। নিন্দুকেরা বলে, হোমিওপ্যাথি কাল্পনিক বিজ্ঞানভিত্তিক— অর্থাৎ যদি দুই আর দুইয়ে চার হয় তবে এ বাড়ীর মাপ, তার পাশের বাড়ীর মাপের সমান হবে, যেহেতু বাড়ী দুটো পাশাপাশি। হোমিওপ্যাথিতে গবেষণা সামান্যই হয়। কিছু ডাক্ত(ার অবশ্য গবেষণা করেন, কিন্তু কি করেন তাঁরাই জানেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধ যদি সত্যিই কার্যকরী হত তবে পৃথিবীময় অ্যালোপ্যাথি ওষুধের মত এর প্রচলন হত(বিশেষত এ ওষুধ যখন অ্যালোপ্যাথি ওষুধের চেয়ে ঢের সস্তা।

আমাদের ভারতবর্ষে কটা হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতাল আছে? যদি বা থাকে তা অ্যালোপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতালের তুলনায় নগণ্য। অবশ্য সরকারী ঔদাসীন্য এর একটা কারণ হতে পারে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা এই কারণই দেখান(কিন্তু প্র্ন হচ্ছে, সরকার অ্যালোপ্যাথির বেলায় কেন উদারহস্ত, আর হোমিওপ্যাথির বেলায়ই বা কেন হাত গুটিয়ে নেন? কারণটা ভেবে দেখবার মতো। যদি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের জন্য অ্যালোপ্যাথির প্রতি এই গু(ত্ব আরোপিত হয়ে থাকে তা হলে প্র্ন উঠবে, হোমিওপ্যাথি নিজের অনুকূলে এই গু(ত্ব অর্জন করতে পারে নি কেন?

পৃথিবীর সব দেশে এই একই অবস্থা। বলতে খুবই ইচ্ছে হয় যে, অ্যালোপ্যাথি যেন বৃহৎ কারখানা আর হোমিওপ্যাথি কুটিরশিল্প। কিন্তু তা বলতে পারা যায় কই?

কবিরাজী আমাদের ভারতের জিনিস। পুরাকালে মনীষীরা পরী(া-নিরী(া ও অভিজ্ঞতায় যা বার করেছেন, আমরা এখন তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছি। মনে হয়, গত পাঁচশো বছরে এ বিদ্যার আর কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। তা সত্ত্বেও একশো বছর আগেও আয়ুর্বেদীয় ওষুধের গুণ ভারতবর্ষে পুরোপুরি স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এখন পৃথিবীময় অ্যালোপ্যাথির এত উন্নতি হয়েছে, এত রকমের কার্যকরী নতুন জোরাল ওষুধ বেরিয়েছে যে, মানুষের আয়ু ২০ বছর বেড়ে গেছে। আমরা খুব উৎসাহিত হই ও গর্ব বোধ করি যখন পাশ্চাত্য দেশে কোনো আয়ুর্বেদীয় ওষুধ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী করে বাজারে ছাড়া হয়। আয়ুর্বেদীয় ওষুধের গবেষণা যদি জোর কদমে চালানো যায় তবে তার সুফল আখেরে অ্যালোপ্যাথিই সব গ্রহণ করে নেবে—অর্থাৎ দুটো একই হয়ে যাবে, কেবল চিকিৎসাপ্রণালীর হয়তো হেরফের থাকবে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে একটা নিয়ম চালু দেখা যায়। শিশুদের সামান্য অসুখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হয়। আর বড়দের যে রোগ অ্যালোপ্যাথিতে সারে না, সেই রোগে হোমিওপ্যাথির প্রচলন আছে। এটা বেশ ভাল নিয়ম। বেশীর ভাগ রোগই ওষুধ না দিলেও সারে, আমরা কেবল ধড়ফড় করি, অপে(া করতে চাই না। দেহের রক্ত(মাংস, শিরা, পেশী, সব সময়ে কোনো অস্বাভাবিক কিছু শরীরে ঘটলে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিক করে দেবার চেষ্টা করে। শরীরবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা এর প্রমাণ পেয়েছেন। সাধারণ লোকও এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত প্রাকৃতিক চিকিৎসা বা Nature Cure-এর আদর্শ এই বি্বাসের উপরেই গড়ে উঠেছে। দেহের নিজেরই সচরাচর স্বাভাবিক আরোগ্য-(মতা (recuperative power) থাকে, আমরা কখনও কখনও সেই আরোগ্যের কৃতিত্ব ভুল করে ওষুধের উপর চাপাই।

আর একটা কথা—অত্যুৎসাহী ডাক্ত(ারের (অ্যালোপ্যাথি) পাল্লায় পড়ে হয়ত গাদা গাদা ওষুধ ও হয়ত বেশ জোরাল ওষুধই শরীরে ঢুকেছে। সে (ে ত্রে সমস্ত ওষুধ বন্ধ করলে বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

এ সম্বন্ধে রাজশেখর বসু মহাশয়ের ‘বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি’ পড়ে দেখবেন।

* * *

জ্যোতিষীরা জন্ম(ণ ও জন্মস্থান বিচার করে ভবিষ্যৎ বলে দেন। কেউ আবার হাতের রেখা দেখে, মুখ দেখে বা কোন ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করেও ভবিষ্যৎ বলে দেন। দেশের অবস্থার ভবিষ্যৎও কেউ কেউ বলেন। তাঁরা যখন বলেন, সময় খারাপ যাবে, তখন বলেন গ্রহশান্তির জন্য হোম করতে অথবা মাদুলী, কবচ, নীলা, পলা ধারণ করতে, তাতে দোষ কেটে যাবে।

প্রায় ৪৫ বছর আগে কাশীতে ৪ বছর বাস করার সময়ে সর্বসমেত ছ'জন বিভিন্ন জ্যোতিষীর কাছে ও ভৃগুসংহিতা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি। শৈশবে আমার মাতামহ বেশ লম্বা হলদে কাগজের রোলে আমার কোষ্ঠী করিয়েছিলেন(সেটাও তাঁদের দেখাই। এঁদের কাছ থেকে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী পাই, তার কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার মিল ছিল না। পরের ৪৫ বছরের জীবনে দেখেছি কোনোটা তিন ভাগের এক ভাগও মেলে নি, বেশীর ভাগই ভুল। অনেকে বলবেন, জন্ম(ণ ঠিক করে নেওয়া হয়নি সে জন্যে মিলছে না। কিন্তু একই জন্ম(ণ থেকে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বলেন কেন? এ ব্যাপার পাঠকরা নিজেরা পরী(া করে দেখতে পারেন, দেশে তো জ্যোতিষীর অভাব নেই। তবে সাবধান, অনেক সময় জ্যোতিষীর ভাষা—হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত— এই ধরনের হয়।

অনেকে পাঁচটা ভবিষ্যদ্বাণীর যদি দুটো মেলে তো সেই দুটো নিয়ে খুব হৈ হৈ করেন, বাকি তিনটে যে মিলল না, তার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। পাঁচটার পাঁচটাই যদি মেলে তবেই তো তা নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। সেরকম নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষী কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। না হলে তো, আমি আপনিই যে কোনো লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি, যার পাঁচটার মধ্যে দুটো মিলবেই। কেবল ভবিষ্যদ্বাণী বলার কায়দা ও ভাষাটা একটু আয়ত্ত করে নিতে হবে, এই যা।

এ সম্বন্ধে অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় (‘ফলিত জ্যোতিষ’) ও রাজশেখর বসু মহাশয় (‘বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি’) লিখে গেছেন।

এ সব সত্ত্বেও অনেক শি(িত ভারতবাসী ও লাখে-একজন পাশ্চাত্যবাসী ফলিত জ্যোতিষে বি্বাস করেন। হয়তো তাঁরা ঠিকই করেন। ভাগ্য ও জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত কোনো কোনো মানুষকে ফলিত জ্যোতিষ সান্ত্বনা ও শান্তি দেয়। সেই

কারণে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বা তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।

তবে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা বা অনুশীলন যদি করতে হয় তবে তা Indian Statistical Institute-এর করা উচিত। তাঁরা যদি এ ভার নেন তবেই কিছু কাজের কাজ হবে।

আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা দীর্ঘকাল অবস্থানুযায়ী সংশোধন না হওয়ার দ(ন পঞ্জিকার তারিখ ২৩ দিন এগিয়ে গেছে ও সেই অনুসারে তিথিন(ত্র রাশিচত্র(ইত্যাদি পাল্টে গেছে। ফলে, চলতি পঞ্জিকামতে ভাগ্যগণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউট কয়েক হাজার মানুষের, নবনির্মিত জাতীয় পঞ্জিকা (রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ) অনুযায়ী জন্ম(ণ, তিথিন(ত্র, জন্মস্থান ইত্যাদির তালিকা ও সেই সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের শিশুকাল থেকে মৃত্যুদিন অবধি জীবনের গতিবিধির পরিসংখ্যান তৈরী করা আরম্ভ ক(ন। আর, পরী(া করে দেখুন যে জন্ম(ণ তিথিন(ত্র ইত্যাদির সঙ্গে ভাগ্যের যোগসূত্র আছে কিনা। যদি তা পাওয়া যায় তাহলে ৭০/৮০ বছরের ভেতরে তাঁরা ভৃগুসংহিতার মত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউট সংহিতা' প্রণয়ন করতে পারবেন। তারপর থেকে এই সংহিতা অনুযায়ী ভারতবাসীদের ভাগ্য গণনা করা যেতে পারবে এবং তা নির্ভরযোগ্য হবে। সেইটাই হবে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ও বি(াসযোগ্য ফলিত জ্যোতিষ। ভাবী জেনারেশনের উপকারের জন্যে ৭০/৮০ বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। আর, তারা যদি কোন যোগসূত্র না পান তবে ফলিত জ্যোতিষের অপমৃত্যু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

* * *

কয়েক দশক আগে অবধি পৃথিবীতে সমস্ত দেশে অনেক ভূত বাস করত, শহরে গ্রামে বিস্তর ভুতুড়ে বাড়ী ছিল ও ভূতেদের দেখা পাওয়া যেত। তার প্রমাণ পাই নানা বইয়ে, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের Hindu Spiritual Magazine-এ, London Psychic Society-র বিবরণীতে। উৎসাহী পাঠক কোনো পাঠাগারে গিয়ে এ সম্বন্ধে দিশী-বিদেশী বই পড়ে দেখতে পারেন। প্‌যান্‌চেট্‌ বিষয়ের বইও পড়ে দেখতে পারেন। এ সবে অনেক লোক নিজের চোখে ভূত দেখেছে, অনেকে ভূতের সঙ্গে কথা বলেছে, ইত্যাদি ধরনের নানা লোমহর্ষক কাহিনী পাবেন এবং এ সব যে আজগুবি নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে খুব দায়িত্বওয়ালা লোকেদের নাম দেওয়া আছে, দেখতে পাবেন। মজা হচ্ছে, আজকাল আর কেউ, দিশী অথবা বিদেশী লোক, 'সত্যি' ভূতের কাহিনী লেখেন না। বুজ(কী ধরা পড়ে যাওয়ায় আমরা এক ধরনের 'সত্যি' ও লোমহর্ষক গল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

যা হোক, ভূতেরা এখন আর শহরে বাস করে না, তারা বাস করছে অশি(ত অধিবাসীদের অঞ্চলে। ভূতের বাস্তবে বাস করার অসুবিধা থাকলে কল্পনায় বাস করার তো কোনো অসুবিধা নেই, সুতরাং ভূত এখন সবটাই কল্পনায় চালান হয়েছে। কিন্তু তার খবরও পাওয়া যায় না(কেন না, খবর পেলেই বিজ্ঞানীরা সেখানে গিয়ে পড়বেন, আর ভূত যে সত্যি ভূত নয়, তা দেখিয়ে দেবেন। মনে হয়, অশি(ত অধিবাসীরা ভূতশূন্য জায়গায় বাস করতে পছন্দ করে না। ভয় পাওয়াতেই তাদের আনন্দ!

প্‌যান্‌চেট্‌ সম্বন্ধেও আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, তার গবেষণা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। ভূতেদের সঙ্গে প্‌যান্‌চেটে-আসা মানুষের আত্মারাও অদৃশ্য বা অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

যুক্তি(বাদী জগৎ ছাড়া অনুভূতি ও বি(াসের জগতও আছে। এই অনুভূতি ও বি(াসে যদি কেউ মনে শান্তি পায়, তবে বলবার কিছু নেই, বাধা দেবারও কিছু নেই।

ঘোষণা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃ(তা

বিষয় শক্তি(ব্যবহার ও সামাজিক সাম্য

বলবেন অধ্যাপক সুজয় বসু

২২ নভেম্বর ২০০৯, বিকেল ৪-টেয়

স্টুডেন্টস্‌ হল, কলেজ স্কোয়ারের পেছনে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে আলোচনা

বিষয় ঃ আয়লার তাণ্ডব ও সুন্দরবন

আলোচক পরিমল মিস্ত্রি ও কল্যাণ (দ্র

১৭ নভেম্বর ২০০৯

বিকেল ৫-৩০

আয়োজক বই - চিত্র

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের দোতলায়

আগামী কলকাতা বইমেলায়

উৎস মানুষ -এর স্টল থাকছে

দেখা হবে।

‘লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি’

অজানা চৌধুরি

শুধু এভারেস্টের উচ্চতা মাপাই নয়, রাধানাথ সিকদার আবহাওয়া বিজ্ঞান নিয়েও অনেক মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু কোথায় গেল তাঁর সেই গবেষণাপত্রগুলো। তারই অনুসন্ধান এই প্রতিবেদনে।

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
... And how you worship Truth's omnipotence.

(ভাবার্থ স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কলির মত ত্র(মউন্মোচনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক তোমাদের মন। আমি প্রাণভরে দেখি, দেখি, তোমাদের সর্বজয়ী সত্যের সাধনা।)

কিশোর শিষ্যদের উদ্দেশে এই ছিল একজন ইংরেজি-ভাষী ভারতীয় কবির প্রার্থনা। সেই ত(ণ কবি-শি(াবিদের নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁরই এক শিষ্য রাধানাথ শিকদার লিখলেন তাঁর সং(প্ত আত্মজীবনীতে— ‘তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে। সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা... এসকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।’ (আর্যদর্শন, কার্ত্তিক ১২৯১)

ঊনবিংশ শতকের বাংলার নব-জাগরণের পথিকৃৎ, স্বাধীন চিন্তা গড়ে তোলার পথপ্রদর্শক ডিরোজিও এমনিভাবে কিশোর প্রাণ-প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। সেই জাগরণের মন্ত্রে অনুব্রতী রাধানাথ শিকদারের কথা দেড়শো বছর পরে একটু ফিরে ভাবতে চাই। তাঁর কাজকর্মের দলিল-প্রমাণগুলো কোথায়? শুধু কি জনশ্রুতি? বলতে কি হবে—‘লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি’? যদি তাই হয়,—কিছুটা ধুলোই তবে তুলে নিই আঁজলায়। ছোট ছোট টুকরো দিয়ে গড়ে তুলি সত্যসন্ধানী রাধানাথের খণ্ডচিত্র। আবেগহীন যুক্তি(ই হোক নিশানা। কারণ ভাবছবি তো চাই না, স্বরূপ-সন্ধানই উদ্দেশ্য। সেই সময়ের আবর্ত-সঙ্কুল সাংস্কৃতিক পরিবেশও কিছুটা জানা যাবে।

ফরাসি-ডাচ-ইংরেজরা যখন তাদের বাণিজ্যতরী রণসাজে সাজিয়ে ভারত-মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিল সেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে তখন সাগরের বিধ্বংসী ঝড়ে বহু জাহাজ জলমগ্ন বা ভগ্নদশা হয়েছিল। সেই সব ঝড়ের বিবরণী সংগৃহীত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক জার্নালে। সংগ্রহ করেছেন হেনরি পিডিংটন নামে এক মাস্টার মেরিনার। ঝড়ের প্রকৃতি, চলন নিয়ে লেখা সেইসব বিবরণী ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম একটি অতি-পরিচিত নাম, এই হেনরি পিডিংটনের নামের সঙ্গেই লেখা একটি কমিটিতে। নামটি রাধানাথ শিকদারের। কমিটির নাম মিটিয়্যর‍্যলজি অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স (মিটিয়্যর‍্যলজি অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি)। কাল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। একটু অবাক হলাম। কারণ রাধানাথ শিকদার তো কাজ করতেন সার্ভে অভ ইন্ডিয়ায়—জরিপের কাজ। আবহাওয়া বিজ্ঞানের কাজে এলেন কবে এবং কী ভাবে? সোসাইটির আবহাওয়া-বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটিতে তিনি ছিলেন দীর্ঘ ছ বছর—১৮৫৭ থেকে ১৮৬২। এই সময়ে তাঁর নামাঙ্কিত দীর্ঘ এবং সংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী বিন্যস্ত আবহাওয়ার তথ্য-সারণী রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিটি মাসিক জার্নালে। আবহাওয়ার মৌল তথ্যগুলি (বাতাসের চাপ, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি) দিয়ে যথাযথ শুদ্ধীকরণসহ সারণীগুলো তৈরি। বায়ুচাপের একটি সংশোধনী সারণীও তিনি তৈরি করে দিয়েছেন নিজের ফর্মুলা দিয়ে—এবং সেটি নির্ভুল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে আবহাওয়া-বিজ্ঞানকে নিতান্তই নবজাতক-বিজ্ঞান বলা যায়। তার বী(ণ-পদ্ধতি, বী(ণ-যন্ত্রগুলির সংশোধনীর প্রথা-প্রকরণ কিছুই কোথাও ঠিকমতো তৈরি হয়ে ওঠেনি। সবে পথ কাটা হচ্ছে। এই সময়ে মৌল তথ্যের বিশুদ্ধীকরণ সহ দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সারণীগুলো সংগ্রাহকের বিজ্ঞানচিন্তার বহুমুখিতা প্রমাণ করে অতি অবশ্যই। এই বিজ্ঞান-(ত্রে রাধানাথের প্রবেশ কবে ঘটল জানতে গিয়ে দেখলাম ১৮৫২ সালের ১১ই নভেম্বরের Friend of India লিখছে—

> ‘This native gentleman lately Head Computer in the same establishment (Great Trigonometrical Survey of India) has long been known the first among the few natives whose scientific aquirements emulate those of Europeans. His services to the Trigonometrical Survey was prominently mentioned by Captain Thuillier and we have little doubt that he will ably fulfill his duties as the head of the office of which he has long been the soul.’

রাধানাথ দেরাদুনের সার্ভে অফিস থেকে কলকাতার সার্ভে অফিসে চিফ কম্পিউটার পদে বদলি হন ১৮৪৯ সালে। ১৮৫২ সালের নভেম্বরে তাঁকে একটি অতিরিক্ত(দায়িত্ব দেওয়া হয় আবহাওয়ার মানমন্দিরের (মিটিয়্যর‍্যলজিক্যাল অবজারভেটরি) সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদের। ১৮৪৯ থেকে ১৮৫২ সাল—মাত্র বছর চারেকে কী এমন ঘটল যে রাধানাথকে বিজ্ঞানে বা অঙ্কে ইয়োরোপীয়দের সমক(ভাবা হল বা তাঁকে একেবারে সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার ‘প্রাণ’ বলে আখ্যা দেওয়া হল! ভাববার কথা। তলিয়ে দেখা যাক।

সার্ভে অভ ইন্ডিয়ায় রাধানাথ আসেন ১৮৩২ সালে, মাত্র ১৯ বছর বয়সে,—তাঁর শ্রদ্ধেয় শি(ক ডঃ টাইট্‌লারের অনুপ্রেরণায়। শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পরে জেনারেল উইলিয়াম ল্যাম্বটন টিপু সুলতানের রাজ্য সামলাতে প্রশাসনিক ও সামরিক কারণে ট্রিগোনোমেট্রিক সার্ভেয়িং-এর প্রবর্তন করেন, ১৮০২ সালে। সেই বীজ থেকে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া গড়ে ওঠে ত্র(মশই। ১৮১৮ সালে জর্জ এভারেস্ট এই কাজে যোগ দেন এবং ১৮২৩-এ ল্যাম্বটনের মৃত্যুর পরে সার্ভেয়র জেনারেল হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইয়োরোপে গিয়ে উন্নততর ফ্রেঞ্চ ও রাশিয়ান সার্ভে পদ্ধতিগুলি শিখে আসেন এবং সমগ্র সার্ভেয়িং-এর কাজটিকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলেন। সেইসময়ে তাঁর প্রয়োজন ছিল কিছু স্বাস্থ্যবান, বিজ্ঞানমনস্ক এবং অঙ্কে পারদর্শী যুবকের। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি হিন্দু কলেজের (প্রেসিডেন্সি কলেজ) শি(ক টাইট্‌লারের কাছে এসেছিলেন। টাইট্‌লার এই সুবিশাল কাজের মর্ম বুঝতে পেরে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় অঙ্ককুশলী ছাত্র রাধানাথ শিকদারকে। ১৮২৯ সালে কলকাতার সার্ভে অফিসে যুক্ত(হয় একটি আবহাওয়া বী(ণ কেন্দ্র (মিটিয়্যরলজিক্যাল অবজারভেটরি)। এটিই পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া মিটিয়্যরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট-এর পাদপীঠ হয়ে ওঠে। সারা ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাত্র তিনটি সরকারি আবহাওয়া-বী(ণ কেন্দ্র বা মানমন্দির (অবজারভেটরি) ছিল—চেন্নাই, মুম্বাই ও কলকাতা।

১৮৩২ সালে সার্ভেয়িং বা জরিপের কাজে যোগ দিয়ে রাধানাথ সোজাসুজি চলে যান হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুন অঞ্চলে। এখানেই ছিল এভারেস্টের গ্রেট আর্ক-এর নর্দার্ন বেস—যেখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির উচ্চতা মাপা শু(হয়। রাধানাথের ভাষায় বলি—'আমি এ(ণে (১৮৩২, ৭ই অক্টোবর) সারভেয়র নিযুক্ত(হইয়া সেরাং বেস্ লাইনে কার্য করার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।'

(আত্মজীবনী, আর্যদর্শন)

রাধানাথের পদটির নাম ছিল 'কম্পিউটর' অর্থাৎ গণক। কিন্তু ভূসমী(া-আহৃত সংখ্যাগণনার যান্ত্রিক কাজে এটি সীমাবদ্ধ ছিল না। হাতে-কলমে জরিপের কাজ রাধানাথকে শিখতে হয়েছে। জরিপের যন্ত্র ও পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ না জানলে আহৃত তথ্যের ভুলভ্রান্তি কী করে ধরা পড়বে! এর সঙ্গেই বুঝতে হয়েছে ভূসমী(া-বিজ্ঞানের মূল তাত্ত্বিক ফর্মুলাগুলি। জিওডেটিক সার্ভেয়িং কাজের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের ত্রিকোণমিতিক মাপজোক যেমন আছে, তেমনি আছে না(ত্রিকী মাপজোকও, সর্বোপরি বায়ুমাধ্যমে আলোর প্রতিসরণজনিত সংশোধনীর প্রয়োগ শেখা। এই অ্যাটমোস্ফেরিক রিফ্র্যাকশন সবসময় এক থাকবে না, বাতাসের তাপ-চাপ-দৃশ্যবস্তুর দূরত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে এটির চেহারা বদল হবে বারবার। সুতরাং প্রযুক্তি(গত কুশলতা ও তাত্ত্বিক কুশলতা—দুটোই অর্জন করতে হবে একই সঙ্গে। তাত্ত্বিক ফর্মুলায় কোনো গঠনগত ভুল থাকলে বা তথ্য আহরণের (ে ত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে এই উভয়দিকে কুশলতা থাকলে তবেই বোঝা যাবে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলাবাহিত পথে যান্ত্রিকভাবে অঙ্ক কষলেই সত্যে পৌঁছনো যায় না। তথ্যের ভুল ঝাড়াই-বাছাই করে তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে বা কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলাকে ভাঙচুর করে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে হবে। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই প্রযোজ্য এই কথা। ফর্মুলা বা তত্ত্বের পথকে একেবারে আদি অকৃত্রিম কষ্টিপাথর বলে ধরে নেওয়া হয় না—সমস্যার মূলে প্রবেশ করে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে ভাবতে হয়। এত কথা বললাম এই কারণে যে অনেকেরই ধারণা যে রাধানাথ শুধু এভারেস্ট-প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলা দিয়ে বড়-বড় অঙ্ক কষেছেন, জরিপের মূল তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশ করেন নি। একথা একেবারেই অসত্য। তাঁর কাজকর্মেই ত্র(মশ সে কথা প্রকাশ পাবে। ১৮৩২ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত রাধানাথ দেরাদুনে ছিলেন। এর মধ্যে প্রায় এগারো বছর কেটেছে তাঁর এভারেস্টের সান্নিধ্যে নানা কাজ শিখে এবং হাতে-কলমে করে। ১৮৪৩ সালে এভারেস্ট অবসর নেন। এই সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি(গত কারণে ১৮৩৮ সালে রাধানাথ বাংলায় ফিরে আসতে চান ডেপুটি কালেক্টরের পদ নিয়ে। এভারেস্ট তখন বাদ সাধেন। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে চিঠি লিখে তিনি রাধানাথকে আটকে দেন। তাঁর অসম্মতি জানিয়ে তদানীন্তন সরকারের কাছে যে চিঠি গিয়েছিল সেটা এইরকম—'... there is no person in my Dept. so thoroughly skilled in the application of the various formula relating to the particular branch of science connected with G. T. Survey. ... Computers comparable to Radhanath cannot be hired in England at a price less than a guinea per diem. ... Radhanath is not only to apply formulas but to investigate them and trained up as he has been from boyhood under my own eye, he would be the cheapest instrument that Govt. ever could employ in a task of this kind.'

এখানে দুটি বিষয় ল(ণীয়। রাধানাথ শুধু ফর্মুলা 'অ্যাপ-ই' করে না—'ইনভেস্টিগেট' ও করে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ফর্মুলায় 'ডিটো' মারে না, মূলে পৌঁছে ফর্মুলাকে নব প্রতিষ্ঠা দেয়। এভারেস্ট তাই তাঁর চিঠিতে লিখছেন—'... if we were to search for persons who can understand and trace their origin the various formulas used with an ability equal to that of Radhanath, the search would only end in the conclusion that persons so qualified would not undertake the business on any terms that could probably be offered to them.'

চিঠিটা থেকে আরেকটি কথা পরিস্ফুট হচ্ছে। রাধানাথ তাঁর ইয়োরোপীয় সহযোগীদের তুলনায় অনেক অনেক কম পারিশ্রমিক পেতেন। তাই এভারেস্ট বারংবার বলছেন কোর্ট অভ ডিরেক্টরদের—একে ছেড়ো না খবরদার, এত কম টাকায় এই গুণপনা কোথাও পাবে না। এইখানে একটা কথা মনে আসছে, এভারেস্টের মূল ফর্মুলা এবং রাধানাথ-কৃত সেইসব ফর্মুলার মডিফিকেশন নিয়ে একটি Auxiliary Table for Surveying রাধানাথ লিখেছিলেন শুনেছি। সেটা কোথায়? সার্ভে অভইন্ডিয়ার কলকাতা অফিসে খোঁজ নিয়েছিলাম। পাই নি।

যাই হোক, ২৫ বছরের রাধানাথের আর ডেপুটি কালেক্টর হওয়া হল না কারণ সরকারি নির্দেশনামায় বেরোল যে, রাধানাথের মতো যারা 'সায়েন্টিফিক' কাজ করে তাদের সার্ভে অভ ইন্ডিয়া থেকে অন্য কোনো সরকারি দপ্তরে ছাড়া হবে না।

১৮৪৩ সালে এভারেস্ট অবসর নিলেন। বই লিখলেন। বইটির নাম 'An Account of the Measurement of Two Sections of the Meridional Arc of India'। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এভারেস্ট সেটি রাধানাথকে দিলেন। লেখা ছিল—'Babu Radhanath - Presented by the Court of Directors of the East India Company, in acknowledgement of his active participation in the survey.' এই 'active participation' কথাটি যথেষ্ট অর্থবহ নয় কি?

১৮৪৩-এর পরে অ্যানড্রু ওয়াহ্ সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং সার্ভেয়র জেনারেল' পদটিতে বসেন। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৯ এই সময়কালে

রাধানাথ দেরাদুনে ওয়াহ্-এর সঙ্গে 'অ্যাটমোস্ফেরিক রিফ্র্যাকশন' নিয়ে বহু কাজ করেছেন। বায়ু-মাধ্যমে আলোর যে প্রতিসরণ হয় সেটি কীভাবে শৃঙ্গের দৃশ্য-উচ্চতাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কী ধরনের সংশোধন প্রয়োগ করতে হবে, তবেই সঠিক উচ্চতার অঙ্কে পৌঁছনো যাবে—ইত্যাদি বিষয়ক ঘষা-মাজাতে রাধানাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অ্যানড্রু ওয়াহ্ রাধানাথকে এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক বলে বিবেচনা করতেন, একথা জানা যায় এস এম চাড্ডা-র লেখা 'সার্ভে অভ ইন্ডিয়া থ্রু এজেস্' পুস্তিকা থেকে (এস. জি. বানার্ড-এর লেখায় কিছু প্রফেশনাল পেপার-এর কথা লেখা আছে তবে সেগুলোর দেখা এখানকার সার্ভে অফিসে পাওয়া যায় নি)।

১৮৫০-এর সার্কুলার অগ্রাহ্য করেই রাধানাথ আরও একবার তাঁর সাঁইত্রিশ বছরে সার্ভে অফিস ছাড়তে চাইলেন। কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদটির জন্য তিনি আবেদন করলেন। যথারীতি আবেদন নামঞ্জুর হল এবং ওয়াহ্ কালবিলম্ব না করে রাধানাথের বেতন-বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। সুপারিশে তিনি লেখেন '...It is a case of long continued exertion, in an ardous profession of unremitting self-cultivation. The masterly characters of the papers contributed by Radhanath to the 'Manual of surveying' have been favourably acknowledged in the Calcutta Review as well as the remarkable purity of a style of writing...' ইত্যাদি।

বেতন বেড়েছিল—তবে হাজারের অঙ্কে নয়—মাত্র ৪০০ টাকা (এস এম চাড্ডা দ্রষ্টব্য)। ইয়োরোপীয়দের চেয়ে বহুগুণে কম বেতনের বি(দ্ধে কেবলমাত্র জগদীশচন্দ্র বসুই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—উনিশ শতকের শেষাংশে। ১৮৫০ সালে সেটা কল্পনার অতীত। এই অবমাননাকর নিম্নবেতন সারা চাকরি-জীবন রাধানাথকে পেতে হয়েছে। রাধানাথের নামও এবার উঠল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার সরকারি রিপোর্টে। তাঁর 'mathematical attainments' যে 'hightest order'-এর সে কথা গলা খুলে বলা হল। এটাই তো অনেক!

ওপরে উল্লিখিত বইটি 'Manual of Surveying for India detailing the mode of operations in the Revenue Survey of Bengal' প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৫১ সালে। এটি ভারতবর্ষে সার্ভেয়িং-এর সর্বপ্রথম প্রকাশিত সরকারি পুস্তক। উনিশ শতকের কালসীমা জুড়ে এই বইটির মান্যতা অপরিবর্তিত ছিল। সুতরাং বইটির গু(ত্ব যথেষ্ট। এর লেখকদ্বয়ের নাম Captains R. Smith এবং H. L. Thuillier। Markham-এর Memoir of Indian Surveys বইটিতে এর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু দেওয়া নেই যা তা হল রাধানাথের নাম আর বইটাতে তাঁর কাজের পরিমাণের হিসেব। রাধানাথের কাজ যে বইটির অন্তরালে ছিল তা ওয়াহ্-এর সুপারিশে উত্ত(হয়েছে। কিন্তু কতখানি ছিল আসুন দেখি। এই বইটির প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে লেখা—'In parts III and V the compilers have been largely assisted by Babu Radhanath Sickdhar, the distinguished head of the Computing department of the Great Trigonometrical Survey of India, a gentleman whose intimate acquaintance with the vigorous forms and mode of procedure adopted on the Great Trigonometrical Survey of India, and great acquirements and knowledge of scientific subjects generally, render his aid particularly valuable. The chapters 15 and 17 upto 21, inclusive, and 26 of part III and the whole of part V are entirely his own, and it would be difficult for the compilers to express with sufficient force, the obligations they thus feel under to him, not only for the portion of the work which they desire thus particularly to acknowledge but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own department.'

প্রয়াত যোগেশচন্দ্র বাগলের ''ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'' থেকে এই সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটা তুলে দিলাম। ভাগ্যিস তিনি লিখে গিয়েছিলেন। কারণ বইটির তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭৫-এ প্রকাশিত। সেখানে রাধানাথের কাজ নিয়ে কিছু লেখা নেই। বইটি কিন্তু অপরিবর্তিত। পরিচ্ছেদগুলো মেলালেই বোঝা যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক যা কিছু লেখা সবই রাধানাথের। প্রথম দুটি সংস্করণে স্বীকৃতিটুকু ছিল, তৃতীয় সংস্করণে চতুর ইংরেজ লেখকদ্বয় সেটুকু মুছে দিয়েছে—রাধানাথের মৃত্যুর পরে। এ নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। পরিণতি কী হয়েছিল সেই প্রতিবাদের সে-কথায় পরে আসছি। এখন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি নিয়ে কিছু বলা যাক।

১৮৪৯-১৮৫২ এই সময়কালে অ্যানড্রু ওয়াহ্ বিহার-দার্জিলিং-নেপাল সীমান্ত বরাবর হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি মেপে চলেছেন তাঁর অনুচরদের নিয়ে। মাকালু, নন্দাদেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা সবাই ধরা দিল তাদের উচ্চতার ফিরিস্তি নিয়ে কিন্তু 'এভারেস্ট' (নামকরণ হয়নি তখনও) রয়ে গেল অধরা। সন্দেহ হচ্ছে যে, এটিই বোধহয় সর্বোচ্চ কিন্তু হাতের মুঠোয় প্রমাণ নেই। এটাও বোধ হয় সেই আলোর প্রতিসরণজাত ভেল্‌কিবাজি। 'Great Arc'-এ লেখক লিখেছেন—'He (Andrew Waugh) and his assisstants ... had observed from Tiger Hill, Senchal, Tonglu and most Darjeeling's other renowned viewpoints.' এসব জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে মনে হতে লাগল সর্বোচ্চ —'Through incidental and unexpected Kanchenjunga's primacy could be seen as a crowning triumph of the Great Arc.'

মাপজোকে অ্যানড্রু ওয়াহ্ নিশ্চিন্ত না হতে পেরে অধরা শৃঙ্গটির নাম দিচ্ছেন কখনও Y (গামা) কখনও b, আবার কখনও 'h'—পরিশেষে আশিটি শৃঙ্গের মধ্যে XV (পনেরো)। এই দোলাচলের মধ্যে ওয়াহ্ পরামর্শ নিলেন রাধানাথের। 'Great Arc' বইয়ের লেখকের ভাষায় বলা যাক—'Waugh then, in the words of Reginald Phillimore the Survey's historian asked the Chief Computer in Calcutta to revise the form (formulas?) for computing geographical position of snow peaks at distances of over 100 miles. The Chief Computer was Radhanath Sickdhar, the Bengali genius whose arithmetical wizardry had so impressed Everest. ...But it is quite probable that Sickdhar's Computations provided the first clear proof of XV's superiority.' *(p. 166 The Great Arc)*

S G Burrard -ও একই কথা বলেছেন—তাঁর 'A sketch of the Himalayan Mountains and Tibet' বইটির পৃ ৭ ও পৃ ২০ তে। পৃষ্ঠা ৭-এ বলেছেন—'The elevation of Mount Everest was first observed in 1849 but its height was not computed till 1852. This was done by the G. T Survey from Bengal.'

পৃষ্ঠা ২০-তে তিনি রাধানাথ শিকদার কলকাতার সার্ভে অফিসের চিফ্ কম্পিউটার যে গণনা কার্য প্রথম করেছেন এই কথা পুন(ল্লেখ করেন।

বুরার্ডয়ের বইয়ের পরবর্তী পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে (১৯৩৩) লেখা আছে যে, এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার কোনো ব্যক্তি(বিশেষের কাজ নয়—জরিপ বিভাগের

এটি যৌথ কাজ (The Discovery of Mount Everest শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর আগের লেখা গিলে ফেলেও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে এই কাজে রাধানাথ সাহায্য করেছিলেন। 'গ্রেট আর্ক'-এর লেখকও তাই বলছেন। কিন্তু সার্ভে অভইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক আর এইচ ফিলিমোর রাধানাথের নামও তাঁর লেখায় উচ্চারণ করেন নি। তিনি লিখছেন তাঁর Historical records of the Survey of India - Vol V -এ যে—'The computations took place in Dehradun'। ব্যস্—উত্তরসূরিরাও তখন একই কথা আউড়ে যেতে লাগল। এস এম চাড্ডা তাঁর 'Survey of India Through the Ages' পুস্তিকায় লিখলেন—'It is not clear whether the Chief Computer who made the calculations was Radhanath Sickdhar or John Hennessey. However Phillimore felt that Radhanath had no share in it.' (Chadha -pp.10-11)

এই জলঘোলা করার প্রচেষ্টা চলেছে প্রায় ১৫০ বছর ধরে। Hennessey—যিনি দেরাদুনে ওয়াহ্-এর সঙ্গে ছিলেন তিনি প্রথম গণনা কার্যটা করেন, না রাধানাথ যিনি কলকাতায় H.L.Thuillier, Deputy Surveyor General-এর সঙ্গে ছিলেন তিনি করেছিলেন। Waugh, Thuillier কেউ কিছু রেকর্ড রেখে যান নি। এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, তদানীন্তন দুই সার্ভেয়র জেনারেলের একজনও রাধানাথের কাজ-কর্মের কোনো পরিষ্কার রেকর্ড-ই রাখতে চান নি বোধ হয়।

বছর দশেক আগে 'এভারেস্ট' শীর্ষক একটি বই হাতে পেয়েছিলাম বইটির লেখক ওয়াট্ আনস্ওয়ার্থ, প্রকাশিত হয়েছে Oxford Illustrated Press Ltd, England থেকে ১৯৮৯ সালে। লেখক একটি চিঠির উল্লেখ করছেন। চিঠিটি দেরাদুন থেকে Waugh লিখছেন Thuillier-কে—যিনি কলকাতায় রয়েছেন।

'We have for some years known that this mountain is higher than any hitherto measured in India and most probably the highest in the world. In justification to my able assistant J.Hennessey, it is proper that I acknowledge that I am gently indebted to him for his cordial cooperation in *revising* these Computations.'

'Revising' কথাটার তলায় দাগ দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি যে, আগে একটা গণনার কাজ হয়েছে। 'গ্রেট আর্ক'-এ আমরা জানতে পেরেছি এতদিনে যে প্রথম 'ক্লিয়ার প্রুফ'টি দেন রাধানাথ শিকদার। বড়-বড় অঙ্কের গণনার ব্যাপারে ''রিভিশন''—ফিরে দেখা বা পুনর্গণনা অবশ্যই দরকার। অঙ্কশাস্ত্রে নানা পদ্ধতিও আছে পুনর্গণনার। না হলে দীর্ঘ সারণী বা জটিল অঙ্কের নির্ভুলত্ব প্রমাণ হবে কী করে! রাধানাথ বী(ণজনিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে শৃঙ্গের উচ্চতাটি কষে বার করেন প্রথমে, পরে সেটিই হেনেসি পুনর্গণনা করেন এবং নির্ভুল প্রতিপন্ন করেন। শৃঙ্গটির মাপজোক, গণনাকার্য ইত্যাদির মধ্যে বহুলোকের শ্রম ও মেধা কাজে লেগেছে। অতএব, অবশ্যই এটি যৌথকাজ। এতে এত জলঘোলা করার কী দরকার? কিন্তু জলঘোলা করা হল নামকরণে। নেপালে শৃঙ্গটির চল্তি নাম থাকা সত্ত্বেও আর্জি খারিজ করে 'এভারেস্ট' নাম রাখা হল ১৮৫৬ সালে। সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার নামের সঙ্গে এভারেস্টের নাম জড়ানো থাকলে একেবারেই অসংগত হতো না—তা না করে নেপালের 'বি(জননী'-র মাথায় বসিয়ে দেওয়া হল এভারেস্টের নামের মুকুট। এ যেন অজন্তার ছবি আবিষ্কার করে একটি ছবিতে নিজের নাম লিখে আসা। জনৈক ইংরেজ নাকি এই অশালীন কাজটি করেছিলেন। সুতরাং এই নামকরণের (১৮৫৬ সাল) অশালীন কাজটির প্রতিবাদ করা উচিত ছিল এভারেস্টের নিজেরই। নামকরণের সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। আমরা বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় সুভাষচন্দ্র বসুকে চিরকাল মনে রাখব, তাই বলে কি মানস সরোবরের নাম পাল্টে রাখব সুভাষ সরোবর! উধম সিং নিজেকে উৎসর্গ করে জালিওয়ানালাবাগের অপমান-অত্যাচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কিন্তু সিন্ধু বা বিপাশার নাম পাল্টে আমরা উধম সিং নদ রাখিনি। প্রাকৃতিক বিস্ময়কর সম্পদের ওপর মানুষের নাম চড়িয়ে দেওয়াটা শোভন নয় এটা বোধ হয় এভারেস্ট এবং Royal Geographical Society ভাবলে ভাল হত। এখন অবশ্য কিছু করার নেই কারণ এভারেস্ট তো আর বেঁচে নেই। ওয়াহ্-এর চতুরতায় অনেক জলঘোলা হয়েছে, এবার Thuillier-এর চতুরতার রকমটা বলি।

যতদিন রাধানাথ সার্ভে অভ ইন্ডিয়ায় ছিলেন, ততদিন Thuillier ঠিক ওয়াহ্-এর মতই রাধানাথকে প্রশংসায় ভিজিয়ে রেখেছেন। ১৮৬২ -তে রাধানাথ অবসর নেন। জার্মানির ব্যাভেরিয়ান সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন, নানা সামাজিক কাজ-কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং ১৮৭০ সালে মারা যান। ১৮৭৫ সালে রাধানাথের কাজের স্বীকৃতিটুকু মুছে দিয়ে Thuillier (তদানীন্তন সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার সার্ভেয়র জেনারেল) Manual of Surveying বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রতিবাদ উঠে এসেছিল তদানীন্তন ডেপুটি সার্ভেয়র জেনারেল জন ম্যাক্ডোনাল্ডের কাছ থেকে—'Penance must be performed for this cowardly sin and robbery of the dead ... a proper honest acknowledgement made for the personal appropriation of the working of the "Ray Trace System" invented by Everest and practically explained by the Hindoo gentleman we have mentioned "Smyth and Thuillier" were honest, but "Thuillier and Smyth" are poor repeaters of dead man's words - we cannot call them the bodysnatchers of Radhanath Sickdhar's spirit.'

আগুনের হল্কার মত এই প্রতিবাদের মধ্যে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে দুটি কথা। প্রথম, এভারেস্ট প্রবর্তিত সার্ভেয়িং 'Ray Trace System'-এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাতা (অতএব প্রকৃত বোদ্ধা) ছিলেন রাধানাথ স্বয়ং। অর্থাৎ যে কথা আগে আমি বলেছি—ভূসমী(া-বিজ্ঞানের মূলে তিনি পৌঁছেছিলেন। দ্বিতীয়, ১৮৭৫-এর সংস্করণটি প্রথম সংস্করণের অপরিবর্তিত পাঠ। Markham এ কথা বলেননি।

রাধানাথকে 'best of the original authors' বলে উল্লেখ করে ম্যাকডোনাল্ড লিখলেন—'We shall command the sympathy of every highly educated native in India for the determination to rescue the name of one of the greatest mathematicians which has adorned the honourable list of those who measured and computed the Great Indian Arc from neglect by those who owe so much to his memory.' (*Friend of India 11th and 24th June 1876*)

ম্যাকডোনাল্ড এই (ৃদ্ধ প্রতিবাদের যথাযোগ্য জবাব পেয়েছিলেন তদানীন্তন সরকারের কাছ থেকে। তাঁকে উচ্চপদ থেকে দু-ধাপ নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছিল এক 'নেটিভ'-কে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু প্র(এখানেই, দেশবাসী কি ম্যাকডোনাল্ড-এর প্রতিবাদী আওয়াজের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল, না চুপ করে গিয়েছিল? লন্ডনে অধুনা যে প্রদর্শনী হল 'গ্রেট আর্ক' নিয়ে সেখানে এই

লেখাটির কথাও কি কোনো সূত্রে আলোচিত হয়েছে? জানতে ইচ্ছে হয়। লেখাটি সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার ফাঁকফোকর নিয়েই লেখা। আজও বোধহয় রয়েছে স্টেটসম্যান পত্রিকার মাঝেরহাট গুদামে। কিছু বাদানুবাদের ইতি টেনে সেদিনের 'ফ্রেন্ড অভইন্ডিয়া' ২৬ শে অগাস্টের সম্পাদকীয়তে লিখল—'According to all appearance an attempt has been made to obtain credit for the authorship of the most scientific portion of the work. ... Had Radhanath Sickdhar been alive we would have left him to fight his own battle.'

বেঁচে থাকলেও পরাধীন দেশে রাধানাথ যুদ্ধ করে জিততেন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে Markham-এর Memoir of Indian Surveys বিংশ শতাব্দীতে রাজচ্ছত্রছায়ায় বসে বিতর্কিত বইটা সম্বন্ধে সর্বৈব বাজে কথা লিখে Thuillier-এর জয়গান গেয়ে গেছে সে কথা সবাই দেখতে পাবে। রাধানাথের নাম এই Memoir -এর কোনো কোণায় নেই।

ভেবেছিলাম এখানেই থামব। পারলাম কই? রাধানাথ তাঁর নবার্জিত আবহাওয়া-বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে নিজেই পথ কেটে একটা মুমূর্ষু Meteorological Observatory -কে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৫২ সালের আগে এখানে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। ২৪ বছরের সংগৃহীত তথ্য বরবাদ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫২ ডিসেম্বর থেকে রাধানাথ যে তথ্য-সারণী তৈরি করেন সেগুলোই 'firmest piece of our knowledge of weather in Calcutta' বলে বর্ণিত হয় India Meteorological Dept.-এর প্রথম Administration Report-এ। উক্তি(টি Dept.-এ প্রতিষ্ঠাতা এইচ এফ ব্ল্যান্ডফোর্ড-এর। তিনি অবশ্য রাধানাথের নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নি। এই তথ্য ভিত্তি করেই তিনি লেখেন প্রথম 'Meteorological Memoir on the Winds of Calcutta'। রাধানাথের স্বীকৃতি বোধ হয় বাহুল্য বলে ভেবেছেন আবারও ব্ল্যান্ডফোর্ড সাহেব। ১৯৫২ সালে অপর একজন ডিরেক্টর জেনারেল ভি ভি সোহনি লিখলেন 'Meteorological Normals of Calcutta'। তিনিও রাধানাথ-সংগৃহীত তথ্য নিয়ে কাজ করে সংগ্রাহকের নামটা উল্লেখ করতে ভুলে গেলেন। ১৯৭৫ সালে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের শতবর্ষ পূর্তিতে বেরোল 'Hundred years of Weather Service— 1875-1975'। সেখানেও রাধানাথ আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক যে কাজ করেছিলেন উনিশ শতকে সেটুকুর উল্লেখ রইল না। না(ত্রিক সময় গণনা করে বন্দরে এবং শহরে সঠিক সময় ঘোষণার যে রীতি রাধানাথ করেছিলেন সেটা মোটামুটি রয়ে গেল এবং তাঁর ব্যবহৃত টেলিস্কোপটি সার্ভেয়িং অফিস থেকে আলিপুর হাওয়া অফিসে স্থানান্তরিত হল ১৮৮০ সালে, কিন্তু রাধানাথের কাজের হিসেব-নিকেশ অবজ্ঞা-অপরিচয়ের ধুলোয় ঢাকা রইল। জেগে রইল শুধু এভারেস্টের কয়েকটি প্রশংসা বাক্য। রাধানাথের কী সৌভাগ্য!

তবে সবচেয়ে মজার এবং অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটলো সেইসময়। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে এক বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড় কলকাতার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। জাহাজ ভেঙে, নৌকো ডুবিয়ে বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ করে, মানুষ মেরে ঝড়টি কলকাতার বাণিজ্য-কেন্দ্রটিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। ফলে বণিকসভা নড়ে চড়ে বসল। তারা ঝড়ের পূর্বাভাস চায়। এই পূর্বাভাস সবে শু(হয়েছে ইংল্যান্ডে। তখনও মজবুত নয়। সরকার ব্ল্যান্ডফোর্ড (পরবর্তীকালে India Meteorological Dept.-এর প্রতিষ্ঠাতা)-কে বললেন ঝড়ের চাল-চলন, (য়-(তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে এক রিপোর্ট তৈরি করতে। এক বড়সড় রিপোর্ট তৈরি হল—সারা বিশ্বে বিতরিত হয়ে মন্তব্য সংগৃহীত হল। এই রিপোর্টে আবহাওয়া বিষয়ক আলোচনায় আমেরিকান আবহাওয়া বিজ্ঞানীর বঙ্গোপসাগরীয় তথ্যের সঙ্গে উপকূলবর্তী রাধানাথেরও কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছিল। ব্ল্যান্ডফোর্ড প্রথম নামটা ঠিকঠাক লিখেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়টা লিখলেন ''Rajkanta Sein''। কে এই রাজকান্ত? ব্ল্যান্ডফোর্ড কি ভুলে গিয়েছিলেন ১৮৬৫ সালেই যে মাত্র তিন বছর আগেও রাধানাথ Meteorological and Physical Committee-তে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন ঐ এশিয়াটিক সোসাইটির Geological Committee-তে। সাধে কি বলি—'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি'।

তথ্যপঞ্জী

১. যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত আর্যদর্শন কার্ত্তিক - ১২৯১- রাধানাথ শিকদারের সং(প্ত আত্মজীবনীর বঙ্গানুবাদ।

২. Letter dated 25th April 1838 from George Everest to the Military Secretary to the Govt. of India - Quoted from The Hindu Patriot, April 18, 1864।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

৪. Memoirs on the Indian Surveys by Clements R.Markham (2nd edition), London 1878

৫. A sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet by Colonel S.G.Burrard, R.E., F.R.S (Supdt., Trigonometrical Surveys) and H.H.Hayden (Supdt. Geological Survey of India) - Published by the order of the Govt. of India, Calcutta 1907-1908

৬. Historical records of Survey of India, Vol IV and V - collected and compiled by R.H.Phillimore, 1954.

৭. Nature, Nov. 10, 1904, p. 43

৮. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXI, 1852 p. 329-332

৯. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1858, 1862

১০. Journal and Proceedings, Asiatic Society, Bengal (New Series) Vol XXV, 1929, No.1 Article No. 12

১১. Report on the Calcutta Cyclone of 5th October, 1864 by Lt. Col. J.E. Gastrell and Henry F. Blanford, 1866

১২. Friend of India, Nov.11, 1852

১৩. Hundred Years of Weather Service (1875-1975), India Meteorological Dept. 1976

১৪. Meteorological Memoirs. Vol I - Part I, India Meteorological Dept.

১৫. Calcutta Review, 1851, Vol XVI, p.321

১৬. "The Great Arc - the Dramatic Tale How India was Mapped and Everest was named " John Keay, Herper Collins 1999

১৭. Modern Review, Feb. 1963 - article by P.C. Kar

গণপতি অসম্ভবকে সম্ভব করতেন!

সমীরকুমার ঘোষ

হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের চাতরা জমিদারবাড়িতে জন্ম জাদুসম্রাট গণপতি চত্র(বর্তীর। গ্রামের নাম ছিল দোড়ে। কত সালে জন্ম, তা জানা যায় না। তখন অত সাল-তারিখ লিখে রাখার রেওয়াজও ছিল না। ঠাকুরদা বেচারাম চত্র(বর্তী ছিলেন চাতরার জমিদার। সবাই তাঁকে চক্কোত্তি ঠাকুর বলে ডাকত। পুত্র মহেন্দ্রনাথ তেমন উপযুক্ত(না হওয়ায় পৌত্র গণপতিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শু(করেন বেচারাম। জমিদারের ঠাকুরবাড়িতে সেই সময় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হত। গণপতির ভাল লাগত তাদের সঙ্গ। তাই 'দাদুভাই বড় হয়ে তুমি কী হবে?' বেচারামের এই প্র(ে গণপতি জানাত, 'সাধু হব'। পড়াশোনায় একদম মন ছিল না, কিন্তু গানবাজনা শেখায়, আর অভিনয়ে দা(ণ আগ্রহ ছিল গণপতির। কিন্তু লেখাপড়া না জানলে জমিদারি সামলানো যাবে কী করে! ফলে দাদু লেখাপড়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। কিন্তু কোনও ফল হয় না। শেষমেশ বেচারাম নাতিকে জমিদারির অংশ থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখান। এতে হিতে বিপরীত হয়। গণপতির শরীরে জমিদারি রক্ত(, মেজাজেও শরিফ। ভয় পাওয়া দূরস্থান তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নি(দ্দেশ যাত্রায়। প্রথমে যান বদ্যিনাথ ধামে। তারপর বহুদিন কাটান বিন্ধ্যাচলে। তখন তাঁর বয়স সতেরো কি আঠারো।

ইলিউশন টি-এর খেলা দেখাচ্ছেন গণপতি

গণপতি বৃদ্ধ বয়সে শিষ্য হিসাবে পেয়েছিলেন এক প্রতিভাবান যুবককে। নাম দেবকুমার ঘোষাল। যিনি পরে 'জাদুসূর্য দেবকুমার' নামে দা(ণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গু(-শিষ্য থাকতেন বরানগরে, এ-পাড়া ও-পাড়ার ব্যবধানে। বিকেলের দিকে প্রতিদিন বৃদ্ধ জাদুসম্রাট প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে গিয়ে বসতেন গঙ্গার ধারে। শিষ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন নোটবই ও কলম। সেখানেই কথার ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ গণপতি শিষ্য দেবকুমারকে বলতেন নিজের অতীতের কথা। জাদুর খেলা নিয়ে আলোচনা করতেন। তবে বালক দেবকুমারের শিষ্যত্ব লাভ অবশ্য খুব সহজে হয়নি। কারণ জাদুবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা। এক বালককে তা শেখালে সে চেপে রাখতে পারবে না, অন্যকে বলে দেবে। এই কারণেই গণপতি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন দেবকুমার ও তাঁর পিতাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রবল আগ্রহে দেবকুমার শিখে ফেলেছিলেন বেশ কিছু খেলা। পকেটে তাস ছিল। নাছোড় বালকের অনুরোধে গণপতি দেখতে চান কী শিখেছে সে। দেবকুমার নাম শুনলেও জানতেন না ওই বৃদ্ধ মহাজাদুকর। তাই নির্ভয়ে দেখান তাসের খেলা। রত্ন চিনতে ভুল হয় না প্রবীণ জাদুসম্রাটের। গণপতিবাবুর জীবনের যেটুকু জানা যায়, তা এই দেবকুমারের দৌলতেই। জাদুসূর্য প্রয়াত হয়েছেন। দুঃখের কথা, তাঁর সেই নোটবইটিও হারিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণপতি চত্র(বর্তী নিজে মস্ত জাদুকর ছিলেন তাই নয়, জাদুগু(হিসাবেও ছিলেন অনন্য। একঝাঁক প্রতিভাবান জাদুকর তৈরি করেছিলেন, যার অন্যতম হলেন আরেক জাদুসম্রাট পি সি সরকার। দেবকুমারের থেকে পি সি সরকার ছিলেন বয়সে বড়। ফলে অনেক বেশিদিন সঙ্গ পেয়েছেন গণপতির। তিনি যদি কিছু লিখে রেখে থাকেন তাহলেই জানা যেতে পারে অনেক অজানা কথা। এ ছাড়াও গণপতির অন্য শিষ্যরা হলেন এ সি সরকার, দেবকুমার, কে লাল, ডি সি দত্ত প্রমুখ।

সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি দুর্বলতা থেকেই গণপতি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ভেবেছিলেন সন্ন্যাসী হবেন। শিখবেন ভারতীয় গুহ্যবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র। এই আশায় বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু জায়গায় ঘোরেন। অনেক সাধুসঙ্গও করেন। সেবা করে, কখনও গাঁজার কল্কে সেজে কারও কাছে শেখেন মন্ত্রতন্ত্র, কারও কাছে ভবিষ্যৎ গণনা, কারও কাছে জড়িবুটির ব্যবহার। অনেক দিন ঘোরাঘুরি করেও তাঁর মন ভরে না। তারাপীঠে বামদেবের কাছেও গিয়েছিলেন দী(া নিতে। 'এ পথ তোমার জন্য নয়' বলে তিনি নাকি নিরস্ত করেন গণপতিকে। ভালই করেছেন। তা না হলে আমাদের দেশের অগণিত স্বামীজি, বাবাজিদের ভিড়ে একজন হয়ে সংখ্যাই বাড়াতেন। তার চেয়ে জাদুকর হয়ে আমাদের দিয়েছেন অনেক, অনেক। বেদেদের পথেঘাটে দেখানো জাদুবিদ্যাকে তুলে নিয়ে এসেছেন মঞ্চে। জাদুবিদ্যা পেয়েছে বিশেষ স্বীকৃতি, সম্মান।

এখানে-ওখানে ভবঘুরেপনা করার সময়েই গণপতি দু-একজন জাদুকরের সংস্পর্শে আসেন। তখন থেকেই জাদু তাঁকে প্রভাবিত করতে থাকে। একজনকে তিনি পরে গু(বলেও খুব মানতেন। খেয়াল রাখা দরকার, ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরায় গু(র কাছে শিষ্য চিরঋণী থাকে। গু(বিদ্যা বা গু(কে অস্বীকার করা মহাপাপ বলে গণ্য হয়। গণপতি আকাশছোঁয়া খ্যাতির সময়েও তাঁর গু(কে অস্বীকার করেননি। দুঃখের কথা তাঁর গু(র নামটা দেবকুমারের খাতার সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে।

সাধু-সন্ন্যাসী না হতে পেরে বিফল হয়ে গণপতি ফিরে আসেন দেশে। তখন তাঁর মাথায় চেপেছে জাদুর ভূত। কিছু খেলা শিখেছিলেন, সেগুলো তো ছিল, বহু খেলা তিনি মাথা খাটিয়ে তৈরিও করে ফেলতেন। এই সব নিয়ে এখানে-ওখানে জাদুর খেলা দেখাতে শু(করেন। সেই সময়ে কোনো এক জমিদারের নজরে পড়ে যান। জমিদারদের যেমন খেয়াল, তিনি গণপতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজি হন। কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল—খেলা দেখানোর সরঞ্জাম তৈরিতে যা অর্থ লাগে তিনি দেবেন। কিন্তু সে সব নিয়ে গণপতি অন্য কোথাও খেলা দেখাতে পারবেন না। কেবল তাঁর বাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠান বা বন্ধুবান্ধবদের

সামনেই শুধু খেলা দেখানো যাবে। গণপতি ব্যাপারটিকে ভেবেছিলেন জমিদারি খেয়াল, কিছুদিন পরে চলে যাবে। তাঁর লাভের লাভ খেলাগুলো। এ রকমই চলছিল। কিন্তু এক জায়গায় আবদ্ধ থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেই সময়েই আলাপ হয় তৎকালীন বিখ্যাত বোসেজ সার্কাসের প্রিয়নাথ বসুর সঙ্গে। প্রিয়নাথ গণপতির জাদু দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সার্কাসে খেলা দেখানোর জন্য প্রস্তাব দেন। খেলার দৌলতে নানা জায়গায় ঘোরা যাবে, তাই গণপতির প্রস্তাবটা মনে ধরে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় জমিদারের শর্ত। কিন্তু জেদি গণপতিকে আটকে রাখা সহজ নয়। তিনি জমিদারের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তবে তাঁকে চলে আসতে হয় খালি হাতেই। কারণ জমিদার কোনো খেলাই তাঁকে নিয়ে যেতে দেননি। ফলে বোসের সার্কাসে আবার নতুন করে তৈরি করাতে হয় খেলাগুলো। লেখাপড়া তেমন না জানলেও গণপতির বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তিনি কোনো খেলাই একজন কাঠ মিস্ত্রিকে দিয়ে বানাতেন না। অনেকটা রাইফেল কারখানার মতো। এক একটা অংশ তৈরি করত এক-একজন। একজন জানত না অপরের কাজ। চূড়ান্ত কাজটা করতেন গণপতি নিজে। তাই খেলা দেখে মিস্ত্রিরা অবাক হতেন। তাঁরা কী করেছেন, আর ব্যাপারটা যা ঘটছে মেলাতে পারতেন না।

বোসেজ সার্কাসের মালিক ছিলেন মতিলাল বসু। কিন্তু সার্কাসের সব কিছুই দেখাশোনা করতেন তাঁর ভাই প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের উৎসাহেই গণপতি সার্কাসে খেলা দেখাতে শু(করেন। প্রথমে হাল্কা চালে, মজার ভঙ্গিতে খেলা দিয়ে শু(করতেন। এই খেলার অন্যতম ছিল (মাল নাচানোর খেলা। খেলাটির একটি নামও ছিল—পিকলু মণির নাচ। অনবদ্য অভিনয়ে, মজাদার ভঙ্গি করে দর্শকদের মজিয়ে দিতেন। এর পরই চলে যেতেন জাদুর সিরিয়াস খেলায়। যেখানে দর্শকেরা বাক(দ্ধ হয়ে সবিস্ময় দেখত অদ্ভুতুড়ে সব কাণ্ডকারখানা। ত্র(মশ গণপতির খেলার চাহিদা বাড়তে থাকে। জনপ্রিয় বোসের সার্কাসে তিনি হয়ে ওঠেন অপরিহার্য শিল্পী। জাদুর ব্যাপারে গণপতির উদ্ভাবনী শক্তি(ছিল অসাধারণ। সার্কাসেই তিনি দেখাতে শু(করেন তাঁর বিখ্যাত দুটি খেলা—'ইলিউশন বক্স' ও 'ইলিউশন ট্রি'। ইলিউশন বক্সে হাত পিছমোড়া করে এবং দু পা কষে বেঁধে গণপতিকে একটি থলেতে পুরে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। সেই থলেটিকে পুরে দেওয়া হত বাক্সয়। বাক্সয় তালা দিয়ে সামনে কালো মশারি ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাদুকর হাত বার করে ঘণ্টা বাজাতেন। তবলায় তুলতেন নানা ধরনের বোল। উল্লেখ্য, ছোটবেলা থেকেই গণপতি ভাল তবলা বাজাতে পারতেন। হাত সরে গেলে পর্দা সরিয়ে দেখা যেত তিনি যেমন বদ্ধ ছিলেন তেমনই আছেন।

'ইলিউশন ট্রি' ছিল আরেক আকর্ষণীয় খেলা। এই জাদুগাছ ছিল আসলে একটি খাড়া ত্র(শ। এই ত্র(শের সঙ্গে তাঁকে শেকল, হাতকড়া ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে আটকে দেওয়া হত যে, তা থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসা কারও প(ই সম্ভব নয়। কারও প(যা সম্ভব নয়, তাকেই সম্ভব করে তুলতেন গণপতি, অবি(াস্য ি(প্রতায়। তিনি দ্রুতবেগে তা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঐ অবস্থাতেই ফিরে যেতেন। ঐ ইলিউশন ট্রি-তে আটকানো অবস্থাতেই তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে পর্দার ভেতর যে পোশাক ছুঁড়ে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দিলেই দেখা যেত গণপতি সেই ছুঁড়ে-দেওয়া পোশাক পরে ফেলেছেন। অথচ তাঁর বাঁধন যেমন কে তেমন রয়েই গিয়েছে। এমনিতে গণপতির দেবদ্বিজে ভক্তি(ছিল প্রবল। নিয়মিত পুজোআচ্চা করতেন। খুব ছোট করে চুল ছাঁটতেন। মাথায় টিকিও ছিল। তাঁর আচার-আচরণ দেখে অনেকেই মনে করতেন, তিনি বুঝি কোনো তন্ত্রসিদ্ধ পু(ষ। অলৌকিক (মতার অধিকারী। মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানেন। এই কারণে লোকের মনে একটা ভয়মিশ্রিত বি(াস এবং সেই সঙ্গে অলৌকিক শক্তি(র প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। গণপতি সেটাকে বজায় রাখার চেষ্টাই করতেন, যাতে তাঁর খেলা দেখানোর সুবিধাই হত। তাই ইলিউশন বক্স ও ইলিউশন ট্রি-র খেলা দুটোকে তাঁরা নিছক ম্যাজিক বলে মেনে নিতে পারতেন না। যাঁরা জানতেন ম্যাজিক জিনিসটা শুধুই ফাঁকি, তাঁরাও গণপতির খেলা দেখে ধন্দে পড়ে যেতেন। মনে করতেন, অলৌকিক শক্তি(একদম না থাকলে এই খেলা দেখানো যায় না। সেই সময়ে পাশ্চত্যের সেরা জাদুকরদের একজন ছিলেন হ্যারি হুডিনি। এসকেপ-এর খেলায়, মানে কোনও বাক্সে বা পাত্রে হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর মুহূর্তে বেরিয়ে আসায় হুডিনির জুড়ি ছিল না। এই ধরনের খেলা গণপতিও দেখাতেন। গণপতির জাদু দেখেছেন এমন অনেক জাদু-রসিকই হুডিনির চেয়ে গণপতিকে এগিয়ে রাখেন। তাঁদের যুক্তি(ছিল, হুডিনি শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করতেন, কৌতুক সৃষ্টির (মতা তাঁর ছিল না। কিন্তু গণপতি বিস্ময় সৃষ্টিতে যেমন অনন্য ছিলেন, তেমনই কৌতুক সৃষ্টিতেও তাঁর সহজাত (মতা ছিল অসাধারণ।

ইলিউশন বক্স এবং ইলিউশন ট্রি-র খেলা দেখানো শু(করার পর গণপতিই হয়ে ওঠেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সার্কাসের অন্যসব খেলা জলো হয়ে যায় তাঁর খেলার কাছে। বাক্সের খেলা দেখার জন্য লোকে পাগল হয়ে যেত। সেটা ১৯ শতকের শেষ দিকে, তখনই গণপতি মাইনে পেতেন মাসে তিনশো টাকা।

বোসের সার্কাস দলের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়েছেন গণপতি। যেখানে গেছেন সেখানেই জয় জয়কার। পরে সার্কাস ছেড়ে নিজে দল গড়েও ঘুরে বেড়িয়েছেন। দু হাতে টাকা যেমন রোজগার করেছেন, পেয়েছেন বহু সোনার পদক, (পোর পদকও। আগেই বলা হয়েছে, অসম্ভব উদ্ভাবনী (মতার অধিকারী ছিলেন গণপতি। নিত্যনতুন খেলা তৈরি করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বিদেশি ম্যাজিকের কথা শুনে, সেটা অনায়াসে করে ফেলতে পারতেন। একেবারে দেশীয় পদ্ধতিতে সেই খেলা দেখাতেন আরও ভাল ভাবে। অসামান্য প্রতিভা ছাড়া এ জিনিস সম্ভব হত না।

বোসের সার্কাসে থাকাকালীনই গণপতি আরেকটি খেলা শু(করেন। তার নাম দেন 'কংস কারাগার'। এই খেলাটিও দা(ণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই কারণে সার্কাসের প্রচারপত্রে এই খেলার কথা থাকত। বোন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই তাঁর প্রাণ নেবে, এই দৈববাণীকে নস্যাৎ করতে কংস দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে কারাগারে আটকে রাখে। দেবকীর সাত-সাতটি সন্তানকে কংস মেরে ফেললেও অষ্টম গর্ভের সন্তান হলে দৈববলে শেকলমুক্ত(হন বসুদেব, পুত্রকে রেখে আসেন যশোদার কাছে। কারাগার থেকে কৃষে(র পিতা বসুদেবের শেকলমুক্তি(র ঘটনা নিয়েই তৈরি হয়েছিল খেলাটি। এতে ব্যবহার করা হত একটা লোহার খাঁচা। ওইটিই ছিল কংস-কারাগার। যার ভেতরে গুচ্ছের হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে গণপতিকে আটকে রাখা হত। যেন কারাগারে বন্দী বসুদেব। ঐ বন্দী অবস্থা থেকে বেরনো কোনো মানুষের কম্মো নয়। কিন্তু গণপতি প্রায় চোখের নিমেষে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং সমান দ্রুততার সঙ্গে খাঁচায় ফিরে যেতেন। খাঁচার সামনের পর্দা সরিয়ে দেখা যেত, খাঁচার দরজা তেমনই তালাবন্ধ, আর ভেতরে গণপতি হাতকড়া, ডান্ডাবেড়ি পরে অসহায় ভাবে বন্দী। কোনো লৌকিক উপায়ে ওরকম অবি(াস্য দ্রুততায় এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, এটা প্রায় কেউই বি(াস করতেন না। তাই কংস-কারাগারের দৌলতে গণপতি হয়ে ওঠেন জীবন্ত কিংবদন্তী। তাঁর খেলা দেখার জন্যই দলে দলে লোকে ভিড়

জমাতো সার্কাসে। গণপতি হয়ে উঠেছিলেন এমনই একজন, অসম্ভব শব্দটা যাঁর অভিধানেই নেই। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, এসকেপের খেলায় সবাই বাক্স থেকে বেরিয়ে এসেই শেষ করেন। গণপতি আবার তার মধ্যে ফিরেও যেতেন। এখানেও তিনি অনন্য।

প্রফেসর বোস মানে প্রিয়নাথ বসু ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। দল চালাতেন খুবই সুশৃঙ্খলভাবে। গণপতির উত্থান তাঁর হাত ধরেই। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন গণপতি প্রতিভায়, ব্যক্তি(ত্বেও সবার চেয়ে আলাদা। তার ওপর গণপতির মেজাজ ছিল খুব কড়া, মুখের ভাষাও। এজন্য সবাই তাঁকে একটু সমীহ করে চলত, আড়ালে বলত 'দুর্বাসা মুনি'। প্রফেসর বোসও গণপতির ে ত্রে অনেক নিয়ম শিথিল করতেন। তারই একটি ছিল পানদোষ। এ নিয়ে দলের অনেকের মনেই ে োভ ছিল। সেই ে োভটা বড় আকার নেয় একটা ঘটনার পর। বোসের সার্কাসে কড়া নিয়ম ছিল মাইনে-করা কোনো শিল্পীর বাইরে আলাদাভাবে খেলা দেখানো চলবে না। এই নিয়ম গণপতি ভঙ্গ করেন। দলের অধিকারীর অনুমতি না নিয়েই নবদ্বীপে পোড়ামাতার মন্দিরের আমন্ত্রণে গিয়ে জাদুর খেলা দেখান। খেলা দেখে যথারীতি অভিভূত মন্দিরের পূজারী। তাঁদেরও দৃঢ় বি(াস ছিল, অলৌকিক শক্তি(না থাকলে এই ধরনের খেলা দেখানো যায় না। জাদু শেষে পূজারী গণপতিকে বলেন, তিনি স্বাধীনভাবে জাদুখেলা দেখানোর দল গড়লে অসাধারণ খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, সম্মান, অর্থ সবই পাবেন। পোড়ামাতা দেবীর আশীর্বাদ রইল তাঁর ওপর। ভক্ত(গণপতিকে পূজারীর কথা প্রভাবিত করে। পরে যখন নিজে দল গড়ে দা(ণভাবে সফল হন, তখন মনে করতেন সাফল্যের মূলে পোড়ামাতারই আশীর্বাদ কাজ করেছে। তখন চিঠিপত্রের শু(তে বিভিন্ন দেবদেবীর নাম লিখে সহায় বা ভরসা ইত্যাদি লেখার চল ছিল। গণপতি চিঠিতে লিখতেন 'শ্রীশ্রী পোড়ামাতা ভরসা'।

মন্দিরে গণপতির খেলা দেখানোর কথা কর্তা প্রিয়নাথ বসুর কানে যায়। অন্য শিল্পীদের ে ত্রে পান থেকে চুন খসাটাও অপরাধ, আর গণপতির ে ত্রে সাত খুন মাপ, এই ছিল গুঞ্জনের মূল সুর। গুঞ্জনটা গণপতির কানেও এসেছিল। বোসের কান ভাঙানোর ে ত্রে দলের কয়েকজন শিল্পী যে সক্রি(য় ছিলেন, এ খবর জেনেও গণপতি তাঁর স্বভাবসুলভ ত্রে(ধ প্রকাশ করেননি। কাউকে কিছু বলেনও নি। এদিকে 'দুর্বাসা' গণপতিকে চটানোর সাহসও নেই প্রিয়নাথের। এই সময় গণপতিই তাঁকে গিয়ে জানান, মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে মায়ের চরণে জাদু-অঞ্জলি দিয়ে এসেছেন মাত্র। এর জন্য তিনি একটি পয়সাও নেননি। তাই সার্কাসের নিয়মভঙ্গের ব্যাপারটা তাঁর ে ত্রে খাটে না। গণপতির যুক্তি(শুনেও অন্য সবার মন রাখতে প্রিয়নাথ পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। গণপতি বিনা বাক্যব্যয়ে তা দিয়েও দেন। কিন্তু ঘটনাটা তাঁকে আঘাত করে। তিনি সার্কাসে যখন খেলা দেখাতে শু(করেন, তখন তাঁর জাদু ছিল সার্কাসের একটি উপাঙ্গ মাত্র, যাকে বলে ফাউ। কিন্তু প্রবল জনপ্রিয়তায় তাঁর খেলাই হয়ে ওঠে আসল। সার্কাসটা ফাউ। নিজের এই সাফল্য, কিছুটা দলের কয়েকজনের সঙ্গে মনান্তর, সর্বোপরি পোড়ামাতার মন্দিরের পূজারীর স্বতন্ত্র দল গড়ার কথা—সম্ভবত এগুলোই সার্কাস থেকে বেরিয়ে নিজের দল খোলায় তাঁকে উদ্‌যোগী করে তোলে। এবং তিনি নিজের দল খোলেনও।

মালিক মতিলাল বসুকে নিজের দল খোলার ইচ্ছার কথা বললে, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বোঝানোর চেষ্টা করেন, খেলা দেখানো এবং দল চালানো এক ব্যাপার নয়। এতে মাথা ঠান্ডা রেখে অনেক কাজ করতে হয়। সেই সঙ্গে গণপতির পানদোষের প্রতি খোঁচা দিয়ে বলেন, দল চালানো তোমার মতো

তাসের খেলা দেখাচ্ছেন গণপতি। ছবি বই -চিত্র-র সৌজন্যে

মাতালের কর্ম নয়। গণপতি লেখাপড়া তেমন না জানলেও আত্মসম্মান বোধ ছিল প্রবল। 'দল চালানো মাতালের কর্ম নয়' কথাটা তাতে জোর আঘাত করে। তিনি না চটে, চ্যালেঞ্জ হিসাবে এটাকে গ্রহণ করে বলেন, 'বেশ, তাহলে মদ খাওয়া ছেড়ে দেব।' এই কথায় প্রফেসর বোস আবার ব্যঙ্গের সুরে বলেন, 'কিন্তু মদ তোমায় ছাড়বে কি!' গণপতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে জবাব দেন, 'আলবত ছাড়বে। ছাড়িয়ে ছাড়ব।'

অনেক অল্প বয়স থেকেই গণপতি মদ-গাঁজা খাওয়া ধরেছিলেন। দীর্ঘদিনের পানদোষ ছাড়া যে প্রায় অসম্ভব এ কথা সবার জানা। কিন্তু গণপতির অভিধানে অসম্ভব কথাটাই ছিল না। এ ে ত্রে তিনি আবার তা প্রমাণ করেন। একদিন সারি সারি বোতল নিয়ে খেতে বসেন। ছেড়ে দেবার আগে শেষবারের মতো খেয়ে নিতে চান। বোতলের পর বোতল শেষ হয়। নেশা, চড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ব্যস, সেই শেষ। আর কেউ কখনও তাঁকে মদ খেতে দেখেন নি। এই ছিলেন গণপতি চক্র(বর্তী। (ক্র(মশঃ)

উৎস মানুষের পরের সংখ্যা
প্রকাশের সম্ভাব্য সময় - জানুয়ারি ২০১০

চার্লস্ ডারউইন — অনিচ্ছুক এক বিপ্-বী

ইয়ান অ্যাঙ্গাস

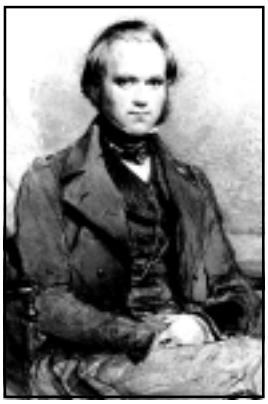

[লেখক *Climate and Capitalism* পত্রিকার সম্পাদক ও *Socialist Voice* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় *Socialist Resistance* ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়। পুনর্বার প্রকাশিত হয় MR Zine পত্রিকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়।]

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেলস **দ্য জার্মান ইডিওলজি** রচনা করেন ১৮৪৬ সালে । ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হিসাবে এটি পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে। এই রচনার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিচের উদ্ধৃতিটি আছে

'আমরা ইতিহাস-বিজ্ঞান, এই একটি বিজ্ঞানকেই জানি। ইতিহাসকে দু দিক থেকে দেখা যায় — প্রকৃতির ইতিহাস ও মানুষের ইতিহাস। কিন্তু এই দুটি বিভাগকে আলাদা করা সম্ভব নয়। যতকাল মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, প্রকৃতির ইতিহাস ও মানুষের ইতিহাস একে অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। প্রকৃতির ইতিহাস, যাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান বলা হয়, তা এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়...'।

মূল রচনার চূড়ান্ত খসড়া থেকে এই অনুচ্ছেদটি তাঁরা শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে দেন। যে বিষয়ে অনুসন্ধান করার ও উপযুক্ত(ভাবে আলোচনা করার সুযোগ নেই, সেই বিষয়ে এমনকি উল্লেখ করা থেকেও বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা তখনও জানতেন না যে প্রকৃতির ইতিহাসের এক অপ্রতিরোধ্য বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই এক ইংরেজ ভদ্রলোক রচনা করে ফেলেছেন। সমাজতন্ত্রের প্রতিতাঁর কিন্তু কোনোই সহানুভূতি নেই। সে রচনাটি পড়ার সুযোগ তাঁরা পান নি, কারণ তার লেখক চার্লস ডারউইন তাঁর নিজের ধারণার তাৎপর্য নিয়ে এতটাই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে কুড়ি বছর ধরে তিনি সেটিকে গোপন রেখেছিলেন।

বিবর্তন বিষয়ে ডারউইনের ধারণা ১৮৩৮ সালের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে। ১৮৪৪ সালে এই বিষয়ে ৫০,০০০ শব্দের এক প্রবন্ধ তিনি লিখে ফেলেন এবং লুকিয়ে রাখেন। যে লেখাকে মার্ক্স নবযুগের সূচনাকারী রচনা বলে আখ্যা দেন সেই লেখাটি কিন্তু ডারউইন ১৮৫৯-এর আগে প্রকাশ করেননি।

ডারউইনের অন্তর্দৃষ্টি

চার্লস ডারউইনের আগে অন্য অনেকেই বিবর্তনের বিষয়টি অনুমান করছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে ও সমাজে বহুল প্রচারিত প্রধান ধারণাটি ছিল এই যে, বিভিন্ন ধরনের গাছ ও জীবের সবগুলিই ভগবান সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিভিন্ন প্রজাতির রূপ চিরকাল একই রকম থাকবে। অল্পসংখ্যক লোক বিশ্বাস করতেন যে সময়ের সঙ্গে প্রজাতিরও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাঁরাও অতিপ্রাকৃত শক্তি(র আশ্রয় না নিয়ে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না। তাঁদের মতে বিবর্তন হল ভগবানের দীর্ঘকালীন এক পরিকল্পনা, নাহয় কোনো এক শক্তি((অর্থাৎ অন্য কোনো এক নামে ভগবান) প্রকৃতিকে বাধ্য করেছে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে।

বিবর্তন একটি বাস্তব সত্য, শুধু এই দাবিটির জন্যই ডারউইনের কাজ যে অনন্য তা নয়। বরং জীবনের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য এবং নকশাগুলি কীভাবে রূপ পরিগ্রহণ করেছে তার পুরোপুরি বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই তাঁর কাজকে অনন্য করে তুলেছে। তিনি যুক্তি(দিয়ে বললেন, বিবর্তনের মূল উপাদান হচ্ছে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন', যে প্রক্রি(য়াকে খুব সহজভাবে সংক্ষে পে বলা যায়

* শেষ পর্যন্ত যে সংখ্যক বংশধর বেঁচে থাকতে পারে তার থেকে বেশি বংশধরের জন্ম দেয় সকল প্রাণীই।

* প্রতিটি প্রজাতির এক সদস্য থেকে অন্য সদস্যের মধ্যে অনেক ভিন্নতা থাকে।

* যে ভিন্নতা এক সদস্যবিশেষের বেঁচে থেকে প্রজনন করার (মতা বৃদ্ধি করে সেই ভিন্নতা সম্ভবত পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায়।

এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের সহায়ক গুণাবলী প্রজাতির পুরো জনসমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে প্রতিকূল গুণাবলী হ্রাস পেতে থাকে। ফলে পুরো জনসমষ্টি পরিবেশের সঙ্গে ক্র(মশ বেশি বেশি করে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

প্রজাতির জনরাশির কোনো অংশ যদি অন্য ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের পরিবর্তন ভিন্ন অভিমুখে হবে। কালক্র(মে এই রকম ভিন্নমুখী পরিবর্তন আলাদা প্রজাতির উদ্ভবের দিকে নিয়ে যাবে।

সচরাচর গাছপালা ও প্রাণীদের আপাত-নিখুঁত রূপ বা নকশার দোহাই দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে সমর্থন করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই রূপ বা নকশার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিযোজনের এই সরল ও ছিমছাম ধারণাটি সেই প্রমাণটি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্ত(াদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। বিংশ শতাব্দীর অভিযোজনবিদ্ আর্নস্ট মায়ারে-র কথায়, ডারউইন 'ধর্মতাত্ত্বিক অথবা আধিদৈবিক বিজ্ঞানকে জাগতিক বিজ্ঞানে পাল্টে দিলেন, প্রতিটি বস্তুরই যে একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে, ডারউইনের এই ব্যাখ্যার পর, কোনো এক উন্নততর বুদ্ধিশীল সত্তার ওপর বিশ্বাস রাখার প্রয়োজন আর রইল না।'

ডারউইনের সময় নেওয়া

একদা সম্ভ্রান্ত সমাজে বস্তুবাদী ধারণা শুধু অপ্রিয়ই ছিল না, এই ধারণাটিকেমনে করা হত নাশকতামূলক এবং রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। ডারউইনের তত্ত্বও পুরোপুরি বস্তুবাদী। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ডারউইন নিজের ধারণাগুলি সাজান। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে এক অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন, রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের জোয়ারে প্-াবিত হয়ে চলেছে। র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণা, বস্তুবাদী, নিরীশ্বরবাদী ধারণা, ছড়িয়ে পড়ছে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের কাছে। অনেকেই এর ফলে বৈপ্-বিক পরিবর্তনের আশা (অথবা আশঙ্কা) করছে।

ডারউইন কোনো সময়েই প্রত্য(রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। বরং তিনি সচ্ছল মধ্যশ্রেণীর এক সুবিধাভোগী সদস্য ছিলেন। আর এই শ্রেণীটিই আত্র(ান্ত হচ্ছিল। জন বেলামি ফস্টারের কথায় 'বুর্জোয়া শ্রেণীবিন্যাসে ডারউইনের ছিল গভীর বি(াস। তাঁর বিজ্ঞান বিপ-বী ছিল, কিন্তু তিনি নিজে বিপ-বী ছিলেন না।'

পাছে লোকে র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে একাসনে বসায় সেই ঝুঁকি থেকে র(া পাবার জন্য ডারউইন তখনকার মত বিবর্তন তত্ত্বকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন নিজের দুনিয়াব্যাপী সমুদ্রযাত্রার জনপ্রিয় বিবরণী লেখার কাজে, প্রবাল শিলা ও আগ্নেয় দ্বীপের বিষয়ে দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কাজে, এবং বার্নাক্‌ল্ (শামুকজাতীয় এক সামুদ্রিক প্রাণী যা জাহাজের তলার কাঠে বা সমুদ্রের তলার পাথরের গায়ে আটকে থাকে) বিষয়ে চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিস্তৃত গবেষণাপত্র রচনায়। ১৮৫০-এর মাঝামাঝি, যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি সুনিশ্চিত আর ১৮৪০-এর সামাজিক উত্তালতা যখন পরিষ্কারভাবে স্তিমিত হয়ে গেছে, তখন তিনি ফিরে এলেন সেই বিষয়ে, যার জন্য আজ তিনি এত বিখ্যাত।

এমনকি তখনও হয়ত তিনি পরের দশক অবধি অপে(া করতেন, যদি না এক ত(ণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ১৮৫৮ সালের জুন মাসে এমন একটি রচনা পাঠাতেন যার ধারণাগুলি ডারউইনের ধারণার প্রায় অনুরূপ। অন্যের আগে নিজের লেখা প্রকাশ করতে হবে, বন্ধুদের এই চাপে পড়ে ডারউইন প্রজাতি বিষয়ে যে বড় বইটি সবে লিখতে শু(করেছিলেন সেটিকে সরিয়ে রাখলেন। আর তাড়াতাড়ি অনেক ছোট একটা বই লিখে ফেললেন — 'অন্ দি অরিজিন অফ্ স্পিসিস বাই মিন্‌স্ অফ ন্যাচারাল সিলেক্‌শন্', প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে, (*The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*) বেঁচে থাকার সংগ্রামে আনুকূল্য-প্রাপ্ত প্রজাতির সংর(ণ। এই বইটি ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

চমৎকারভাবে যুক্তি(বিন্যস্ত এবং জনবোধ্য ভাষায় লেখা এই বইটি বেস্ট সেলারের পর্যায়ে চলে গেল। প্রকাশক ১,২৫০ কপি ছাপলেও প্রথম দিনেই ১৫০০ কপির অর্ডার পেলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ৩০০০ কপির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল আর পরবর্তী দশ বছরে আরো চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হল। শতাব্দী শেষ হওয়ার মধ্যে শুধু ইংল্যান্ডেই বইটির এক ল(দশ হাজার কপি বিক্রি(হয়েছিল।

বহু বৈজ্ঞানিক, বিশেষ করে ত(ণ বৈজ্ঞানিকেরা, ডারউইনের মতামত অবিলম্বে স্বীকার করে নিলেও, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও ধার্মিক নেতারা একযোগে এর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। সমালোচকেরা বার বার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত(দুটি বক্ত(ব্য তুলে ধরতে লাগলেন প্রাকৃতিক নির্বাচনে ভগবানের কোনো ভূমিকাই নেই, আর (ডারউইন খুব সতর্কভাবে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলেও) মানুষও অতি অবশ্যই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই সৃষ্ট। দুটি ধারণাই ভগবান-বিদ্বেষী, দুটি ধারণাই বিদ্যমান সামাজিক বিন্যাসকে অস্বীকার করছে।

এমনকি যেসব বৈজ্ঞানিক বাইবেলকে আ(রিক অর্থে গ্রহণ করেন নি আর ডারউইনের যুক্তি(র অনেকাংশের সঙ্গেই সহমত, তাঁদের মধ্যেও অনেকে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, বিবর্তনের চালিকাশক্তি(হিসাবে অথবা মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিমত্তার দৈবিক উৎস হিসাবে ভগবানকে অবশ্যই এই ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত(রাখতে হবে। নিজেদের প্রতিত্রি(য়াশীল এবং জাতিগত সংস্কারের সপ(অনেকে এই মতকে ব্যবহার করেছেন। যেমন ভগবান কালো ও সাদা মানুষদের পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন!

শ্রমজীবী শ্রেণীর সমর্থন

ডারউইনের বই নিয়ে আলোচনা কেবল বৈজ্ঞানিক বা ধর্মযাজকদের মধ্যেই আটকে ছিল না। একজন দ(শ্রমিকের বেশ কয়েকদিনের বেতনের সমান, পনেরো শিলিং দামের এই বই অরিজিন অফ্ স্পিসিস অনেক শ্রমিকের বাড়িতে রাখবার প(বড্ড বেশি দামি। কিন্তু অনেক শহরেই র‍্যাডিক্যাল শ্রমিকদের গোষ্ঠীগুলি চাঁদা তুলে একটি করে কপি কিনতে লাগল যাতে একজনের থেকে নিয়ে আরেকজন পড়তে পারে।

ডারউইনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী টমাস হাক্সলি লন্ডনের শ্রমজীবী মানুষদের জন্য বিবর্তন বিষয়ে অনেক শ্রোতার উপস্থিতিতে একের পর এক প্রকাশ্য বক্ত(তার আয়োজন করেন। এই বক্ত(তাগুলি পরবর্তী সময়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। মানুষও যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল এবং সকল মানুষই যে অভিন্ন এক পূর্বপু(ষ থেকে উদ্ভূত, সেই বক্ত(ব্যকে হাক্সলি নির্দ্বিধায় সমর্থন জানিয়েছেন এই সব বক্ত(তায়। ডারউইনের বইটির মূল কথা ঐটাই।

শু(তে মাত্র এক জোড়া থেকেই মানবজাতির উদ্ভব, 'একথার বলার কোনরকম প্রমাণ নেই। আমাকে বলতেই হবে যে আমি এমন কোনোরকম সঠিক ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি না, বা সমর্থনযোগ্য এমন কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না যার থেকে বি(াস করতে পারি যে মানুষের একাধিক প্রজাতির অস্তিত্ব আছে।'

কার্ল মার্ক্স হাক্সলির অনেকগুলি বক্ত(তায় নিজে হাজির ছিলেন আর রাজনৈতিক সহকর্মীদের হাজির থাকার জন্য উৎসাহিতও করতেন। ওঁর বন্ধু ও কমরেড ভিলহেল্‌ম্ লিবনেখ্‌ট পরবর্তী সময়ে স্মরণ করছেন—'যখন ডারউইন তাঁর গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি জনগণের অবগতির জন্য সকলের সামনে উপস্থাপিত করলেন, তখন আমরা ডারউইন আর তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রগাঢ় শু(ত্ব ছাড়া মাসের পর মাস অন্য কোনো বিষয়ে কথাই বলতাম না।'

অরিজিন অফ্ স্পিসিস বইটির প্রথম ১২৫০ কপির একটি কপি ফ্রেডেরিখ এঙ্গেল্‌স্ জোগাড় করেন। তিনি মার্ক্সকে লিখছেন যে বইটি 'একেবারে চমৎকার'। মার্ক্সও সহমত হলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের কাছে বইটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল। ডারউইনের 'যুক্তি(উপস্থাপনায় ইংরেজ ঘরানার অমার্জিত রীতি' আর ম্যালথাসের স্বপ(ইতিবাচক উল্লেখ তাঁরা পছন্দ করেন নি। তাঁরা নিজেরা জীববিজ্ঞানী ছিলেন না। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন না অন্য কোনো প্রাকৃতিক পদ্ধতি বিবর্তন প্রত্রি(য়ার মূল চালিকাশক্তি(, এই বিতর্কে তাঁরা কোনো বিশেষ প(অবলম্বন করেন নি। অ্যান্টি-ড্যুরিঙ্ (১৮৭৭) বইটিতে ডারউইনকে জোরের সঙ্গে সমর্থন করতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স্ লিখলেন, (ডারউইন যার সঙ্গে অবশ্যই একমত হতেন)

> 'বিবর্তনের মতবাদ একদিক থেকে দেখতে গেলে এখনও উপলব্ধির প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। সেই কারণে আরো গবেষণার ফলে প্রজাতির অভিযোজন প্রত্রি(য়া বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ডারউইনীয় ধারণা সহ আমাদের বর্তমান ধারণা যে বিরাটভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ডারউইন প্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌স্ ও মার্ক্স বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই কারণে যে ডারউইন দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতিরও ইতিহাস আছে। 'সমাজতন্ত্র কাল্পনিক ও

বৈজ্ঞানিক' (Socialism : Utopian and Scientific) বইতে তাঁরা লিখলেন

> 'প্রকৃতি কাজ করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, অধিবিদ্যামূলক (মেটাফিজিক্যাল) পথে নয় ... বারবার আবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্তহীন একই অবস্থায় ফিরে ফিরে আসার পথে প্রকৃতি চলে না। বাস্তব ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি এগিয়ে চলে। এই প্রসঙ্গে ডারউইনের নাম অতি অবশ্য সর্বাগ্রে করতে হবে। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটে চলেছে যে বিবর্তন ক্রি(য়া, সকল প্রাণী, গাছপালা, জীবজন্তু এবং মানুষ স্বয়ং যে তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রমাণ হাজির করে প্রকৃতি প্রসঙ্গে আগে যে আধিদৈবিক ধারণা ছিল, ডারউইন সেই ধারণাকেই ভীষণভাবে আঘাত করলেন।'

প্রকৃতির ইতিহাস আর মানুষের ইতিহাস একে অন্যের থেকে অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল — যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ ১৮৪৬ সালে এই কথাগুলি প্রথমে লিখেছিলেন আর পরে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, তার সত্যতা প্রমাণিত হল অরিজিন অফ্ স্পিসিস-এ। এই বইতে প্রকৃতির ইতিহাসের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া গেল সেই ব্যাখ্যা তাঁদের মানব ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিপূরক। ১৮৬১ সালে মার্ক্স লিখছেন, ডারউইনের কাজ 'আমাদের নিজস্ব মতামতের স্বপ(ে প্রাকৃতিক ইতিহাসলব্ধ বুনিয়াদ।'

মানবতার এক বিজয়োল্লাস

বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি ডারউইন দায়বদ্ধ ছিলেন। তার প্রমাণ এই যে নিজের মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারে যে দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিল, সেটা কাটিয়ে ওঠার পরে সে সময়ের প্রভাবশালী মতামত পোষণকারী নেতাদের বিরোধিতা করে তাঁর এই মতামতগুলিকে র(া করার কাজে তিনি সারা জীবন ধরে লেগে রইলেন। ১৮৮২ সালে যখন তিনি মারা গেলেন ততদিন বিবর্তনের সত্যতা বৈজ্ঞানিক মহলে প্রায় বি(্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে ফেলেছে।

পরবর্তী সময়ের গবেষণায় বিবর্তন বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি গভীরতর হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন যে এক মৌলিক ভূমিকা পালন করে, ডারউইনের এই বি(্বাস সেই গবেষণায় দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সবার ওপরে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রতি ডারউইনের যে দায়বদ্ধতা ছিল, তা জয়যুক্ত(হয়েছে। আধুনিক কোনো বৈজ্ঞানিকই, এমন কি গভীর ধর্মপ্রাণ বৈজ্ঞানিকরাও, যে-কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসাবে এ কথা বলতে পারবেন না যে 'তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল।' সৃষ্টি কী করে হল, কোথা থেকে এই বিপুল বৈচিত্র্য এল, আমাদের এই গ্রহটিতে প্রাণের চরিত্র যেভাবে বদলে যাচ্ছে সমস্ত প্র(্নেই এ কথা প্রযোজ্য।

বিজ্ঞানের এই বস্তুবাদী বিজয় মানব সমাজের এক বিরাট সাফল্য। যাঁরা জীবনের সর্ব(ে ত্রে অন্ধবি(্বাস ও অজ্ঞতা দূর করে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চান, তাঁদের সকলেরই উচিত শুধু এই জন্যই চার্লস্ ডারউইনকে স্মরণ করা ও সম্মানিত করা। তাঁর দ্বিধা, কালহরণ বা মধ্যশ্রেণীর সংস্কার সব কিছু নিয়েই। 'প্রকৃতি শুধু যে বিদ্যমান থাকে তাই নয়, তা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে ও বিলুপ্তও হয়ে যায়' (এঙ্গেলস্-এর) এই ধারণা ঠিক একই রকমভাবে এক বি(প্-বী ধারণা আর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় একই গু(ত্বের দাবিদার পুঁজিবাদ আজ শুধু যে বিদ্যমান আছে তাই নয়, এ এক বিশেষ সময়ে রূপ লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে এও বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই ধারণাও সমান গু(ত্বপূর্ণ।

অনুবাদ **প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়**

বিজ্ঞান ও নয়া সামন্ততন্ত্রের উত্থান

কিরণ কারনিক

এ বছর দূরবী(ণ যন্ত্রের ব্যবহারের ৪০০-তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এই যন্ত্রটি শুধু যে বিজ্ঞানচর্চায় বৈপ্-বিক পরিবর্তন এনেছিল তাই নয়, আমাদের সামগ্রিক পরিচয়ের ওপরও এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে হল্যান্ডে এই যন্ত্রের উদ্ভাবন। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্র(ান্ত পর্যবে(ণের কাজে সর্বপ্রথম এটি ব্যবহার করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো প্রাচীন বিজ্ঞানকে এই যন্ত্র অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিল। একই সঙ্গে এর ব্যবহার থেকেই ভূ-কেন্দ্রিকতায়, অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান মহাবি(্বের কেন্দ্রে এই খ্রিষ্টীয় ধর্মবি(্বাসের সমাপ্তি সূচিত হয়েছিল। হঠাৎ মানুষ আবিষ্কার করল যে সে মহাবি(্বের প্রান্তে অবস্থিত এক (ুদ্র গ্রহের (ুদ্রতর জীব। খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান এই ধারণাকে অধার্মিকের প্রলাপ বলে আখ্যা দিল। ধর্মীয় আদালতে গ্যালিলিও ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত(হলেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তাঁকে গৃহবন্দী হয়েই কাটাতে হয়েছিল। শু(হল ধর্মান্ধতার বি(দ্ধে বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘাত।

এখন এটা পরিষ্কার যে এ লড়াইয়ে বহুদিন আগেই বিজ্ঞানের জয় হয়েছে। মহাবি(্বের এক প্রান্তে একটি (ুদ্র সৌরমণ্ডলে (ুদ্রতর এক গ্রহ হল এই পৃথিবী—এ কথার বি(দ্ধাচরণ সাধারণত কেউই আজ আর করে না। তবুও প্র(্ন জাগে, বিজ্ঞানের এই জয় কি সত্যিই নিরঙ্কুশ? অন্ধবি(্বাস—তা সে ধর্মীয় বা ধর্মনিরপে(যাই হোক না কেন—অনুশাসন, হুকুম আর ফতোয়ার ওপর বিজ্ঞান কি সত্যিই টেক্কা দিতে পেরেছে? বিজ্ঞান ও তার অনুগত সহচরী প্রযুক্তি(কে সভ্যতার বিকাশে এক অতীব গু(ত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবেই শুধু নয়, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক নির্ণায়ক ও চালিকাশক্তি(রূপেও একে গণ্য করা হয়। ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানের উন্নতিবর্ধন ও বিকাশসাধন আজ সাংঘাতিক গু(ত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞান মানে জিজ্ঞাসা, পুনর্নিরী(া আর সন্দেহ প্রকাশ। যে তত্ত্ব আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়, তাকে বর্জন করা অথবা নতুন নতুন পর্যবে(ণের আলোকে সেগুলোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোই বিজ্ঞানের কাজ। কোনো প্রদত্ত তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপাদনে জোর করে কোনো তথ্য গুঁজে দেওয়া বিজ্ঞানের কাজ হতে পারে না। শত শত বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানচর্চার আজ মানে হল পর্যবে(ণ - প্রকল্প - সত্যতা প্রতিপাদন -তত্ত্বের এক চক্র(। যেটা আরো গু(ত্বপূর্ণ, তা হল বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিছুটা সন্দেহবাদ এবং জিজ্ঞাসার মনোভাব। এগুলোর প্রতি সহনশীলতা, উৎসাহপ্রদান, এমনকি প্রশ্রয়দান এবং বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া বিজ্ঞানের ব্যাপক ও স্বাভাবিক বিকাশের চাবিকাঠি। অনমনীয় মনোভাব এবং কঠিন আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো একে ম্যাড়মেড়ে করে তোলে। এরকম পরিবেশ বিজ্ঞানের বিকাশের (ে ত্রে (্বাসরোধকারী।

যে সব প্রতিষ্ঠান আর সংগঠন ওপরের কথাগুলির সঙ্গে সহমত এবং এক মুক্ত(, অনুশাসনরহিত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে স(ম, তারাই মহান বিজ্ঞানের জন্মদাতা। এই কারণেই ঐতিহ্যগতভাবে মুক্ত(ও স্বাধীন চিন্তার পীঠস্থান স্বরূপ বি(্বিদ্যালয়গুলি যে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সূতিকাগৃহ হয়ে উঠেছে, তাতে

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই নীতির অনুসরণ করে নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা স্বাধীন সংগঠনগুলোও এ কাজে সফল।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এই প্রয়োজনীয়তার বর্ধমান স্বীকৃতি মিললেও ভারতে সামাজিক ে ত্রে এর বিপরীত প্রবণতাই কিন্তু ল(্য করা যায়। ধর্ম থেকেই রাজনীতিকে রসদ সংগ্রহ করতে হয়(সেই কারণেই চারপাশে ফুটে উঠছে ধর্মের আচার-সর্বস্বতার বৃদ্ধির চিহ্(। শত শত বছর ধরে বেশ কিছু মানুষ হিন্দু ও বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতাবাদের মতো মুক্ত(ও বহুমুখী দর্শনকেও আচারপরায়ণতার মোড়কে মুড়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এ কাজটা মেরে ফেলার জন্য দেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক জোর। ''তোমার ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে বলেই কোনো কিছুকে বি(্বাস কোরো না, (অথবা) তোমার শি(ক বা গু(জনের পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিও না। কোনো কিছুকে দেখেশুনে, তাকে যাচাই করে যখন দেখবে যে তা যুক্তি(গ্রাহ্য এবং সকলের প(শুভ ও মঙ্গলজনক, তখন তাকে গ্রহণ করবে এবং সর্বতোভাবে তা মেনে চলবে''—এই ছিল স্বয়ং বুদ্ধের উপদেশ। নতুন তথ্য অথবা সদ্য অর্জিত উপলব্ধির ফলে আজকের তত্ত্ব আগামী দিনে পথের ধুলোয় লুটাতে পারে—বিজ্ঞানচর্চার এর থেকে ভালো ব্যাখ্যা আর কীই বা হতে পারে এই কারণেই এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের চরম গৌরবের সময় নালন্দা আর ত(শীলার মতো শি(াকেন্দ্রগুলো ছিল গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার বি(্বেবন্দিত পীঠস্থান।

বিজ্ঞানের বিকাশ যদি, কোনো প্র(্নের উত্তর সম্পর্কে প্র(্ন করা, সন্দেহ প্রকাশ করা, পুনর্মূল্যায়ন করা এবং বিকল্পের অনুসন্ধানের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সে(ত্রে অন্ধবি(্বাসের কোনো স্থান থাকতে পারে না। একইভাবে, যতই বিখ্যাত, ধনী বা (মতাশালী হোক না কেন, এমন কোনো ব্যক্তি(নেই যার বক্ত(ব্যকে যাচাই বা বি(-ষণ করা যাবে না বা বিশেষ ে ত্রে বিরোধিতা করা যাবে না। এটাই হল বিজ্ঞানের এক সহজাত সঙ্গী প্রকৃত গণতন্ত্রের সারকথা এবং সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের বি(দ্ধ মতবাদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের এটা স্বীকার করা দরকার যে নয়া-সামন্ততন্ত্রের বৃদ্ধির প্রবণতা ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশের প(এক ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে এর প্রকাশ সবচেয়ে নগ্ন। এখানে সদম্ভ নিজের পরিচয় জাহির করা তর্জন-গর্জনকারী ('জানিস, আমি কে?') থেকে শু(করে 'আমার পায়ের তলায় গোটা দুনিয়া' গোছের ভাবধারী রাজনীতিবিদ অথবা ধনী ও (মতাশালী বাপ-মায়ের পুরোপুরি উচ্ছন্নে যাওয়া টাকা-ওড়ানো কুলাঙ্গারদের ভীড়। গ্রামাঞ্চলে এদের বদলে দেখা মেলে বড়ো বড়ো ভূস্বামী অথবা বন্দুক-ওঁচানো রাজনৈতিক অপরাধী নেতাদের (প্রায়শই এরা কোনো জাতের নেতাও বটে)। বিরোধীদের প্রতি এরা নির্মম, আর নিজের প্রজাদের প্রতি উদারহস্ত। কর্পোরেট দুনিয়াতেও দেখা মিলবে নতুন মহারাজাদের। এদের প্রভুত্ব খুবই স্পষ্ট, আর তাদের মুখের কথাই আইন।

বহু নেতা রয়েছেন, যারা বিরোধিতা আর বিতর্কের কণ্ঠরোধ করতেই ব্যস্ত। প্রজাপালক সরকার হামেশাই নিদান দিচ্ছে কী কী কাজ প্রাপ্তবয়স্কদের করা উচিত নয়। অনেক শি(ক রয়েছেন যাঁরা ছাত্রদের প্র(্ন করার উদ্যমকে নি(ৎসাহিত করতে সচেষ্ট। মুক্ত(চিন্তা আর অনুসন্ধানের—যা কিনা বিজ্ঞানের সারকথা—কণ্ঠরোধ করতে এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান আছে। যেখানে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মান্যতা বা বি(্বাস অর্জন বর্জনীয় নয়, সেরকম মুক্ত(ও সহনশীল পরিবেশে বিজ্ঞান সবচেয়ে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। কোনো বিশেষ এক গোষ্ঠীকে আঘাত করছে বলে যে সমাজ কোনো বই, নাটক বা চলচ্চিত্রকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তা অবশ্যই বিজ্ঞানবিরোধী এবং সেই কারণেই বিকাশের ে ত্রে প্রতিবন্ধক।

অনেকেই, বিশেষ করে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ কিছু মানুষ শৃঙ্খলা আর পারদর্শিতা অর্জনের সহজ রাস্তা হিসেবে নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জুজু দেখানোর জন্য ব্যগ্র। এরকম একটা ব্যবস্থা হয়ত কার্যকরী হতে পারে, তবে তা স্বল্পমেয়াদী হতে বাধ্য। কিন্তু তার জন্য বলি চড়াতে হবে ব্যক্তি(স্বাধীনতা, মুক্তি(আর বিকাশ। বেশ কিছুকাল পরেই এর সামাজিক মূল্যের পরিমাপ করা হয়তো সম্ভব হবে, যা কিনা স্পষ্টতই এক ভয়ংকর রূপ নিতে বাধ্য। খুব শিগগিরই নাগরিকেরা এর ফলে পরিণত হবে নিছক প্রজায়।

এরকম নয়া- সামন্ততন্ত্র বিজ্ঞানের প(অভিশাপ। হালকা চালে বললে বলতে হয়, গাড়ির মাথায় লালবাতি জ্বালানো মানে বিজ্ঞানকে লালবাতি দেখানো। যে সরকার বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি(কে এক গু(ত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে এবং উন্নয়নের ধারা দীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখতে বিজ্ঞানকে অপরিহার্য মনে করে(যে বাণিজ্যিক জগৎ নিজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির বনিয়াদ হিসেবে বিজ্ঞানের গু(ত্বকে স্বীকার করে(এবং সমাজ পরিবর্তন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ে ত্রে বিজ্ঞানের অবদানকে যে সুশীল সমাজ উপলব্ধি করতে স(ম—সময় এসেছে এই তিন প(কে নয়া-সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে আমাদের র(া করতে একজোট হয়ে কাজ করার। রূপকার্থে এবং সত্যি সত্যিই সময় এসেছে গাড়ির মাথা থেকে লালবাতি হঠানোর।

অনুবাদ **পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়**

'Science & the emerging neo-feudalism'
Kiran Karnik
Tuesday 1 September 2009, The Economic Times

সংগঠন সংবাদ

বিজ্ঞান চেতনায় মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৩ আগস্ট আযোজিত হয় 'বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান মেধা' পরী(া। হাবড়া হাইস্কুল ও কালীতলা বাণীমন্দির হাইস্কুলে। গত৭-৮ বছর ধরে এই পরী(ার আয়োজন করা হচ্ছে। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী ৫০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী এবারের পরী(ায় বসে। ১০০ নম্বরের পরী(া। ৭০ নম্বরের প্র(্ন থাকে আয়োজকদের তৈরি পুস্তিকা থেকে। এতে থাকে চ(দান, রক্ত(দান, জ্যোতিষ, সূর্যগ্রহণ থেকে বিখ্যাত লেখকদের উদ্ধৃতি। বাকি ৩০ নম্বরের প্র(্ন থাকে পাঠ্যবই থেকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম তিন পরী(ার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। ২৫ অক্টোবর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল 'হাবড়া কামিনী কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে'। অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। অনুষ্ঠানের শু(তে 'অ(য়কুমার দত্তের যুক্তি(বাদী মানসিকতা' নিয়ে বলেন বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ী। আলোচনার শেষে জমে ওঠে প্র(্নোত্তর পর্ব। নানান কৌতূহলী প্র(্নের জবাব দেন আশীষবাবু। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দুই প্রবীণ সংগঠক নির্মল সিংহরায় ও রতন বণিকের দ(তায় অনুষ্ঠানটি অন্যমাত্রা যোগ করে।

যক্ষ্মা, নিঃশব্দে বিছিয়ে চলেছে মৃত্যুজাল

শর্মিষ্ঠা দাস

'দাদা, আমি বাঁচতে চাই — আমি বাঁচতে চাই' — দু-এক দশক আগেও 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখতে দেখতে আকাশে বাতাসে অনুরণিত নীতার এই আকুতি আমাদের একটা ঝাঁকুনি দিত ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ে আমরা একটা ছদ্ম সুর(ার আবরণের মধ্যে বসে অবাক হতাম — 'সত্যি! কি দুর্দিনই না ছিল! টিবি-র মতো রোগেও মানুষ মরত!' আরো অনেক বেশি অবাক হবার পালা তখনো বাকি ছিল।

১৯৪৫-এ স্ট্রেপ্টোমাইসিন এবং তারপর একে একে আরো অনেক ওষুধ আবিষ্কারের পরে 'যক্ষ্মা'-র দৃশ্যপটে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছিল — এমনকি কোনো চরিত্রের প্রয়োজনে জুড়ে দেওয়া 'কাশি-রক্ত(পড়া-টিবি-মৃত্যু' খুব হাস্যকর চিত্রনাট্য হয়ে যাচ্ছিল বলে বাংলা সিনেমার পরিচালকরাও খুব মুস্কিলে পড়েছিলেন। ১৯৬৩-তে অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯২০-২১ সালে যেখানে প্রতি লাখ জনসংখ্যায় বছরে যক্ষ্মা রোগে ৪০০ জন মারা যেতেন, ১৯৫০-৫১-তে তা নেমে আসে ২০০ জনে, ১৯৬৪-তে ১০০ এবং ১৯৭০-৮০-তে ৮০ জনে। এর ফলে রোগটা সম্পর্কে মানুষের ভীতি কেটে যায়, যক্ষ্মা রোগী বা তার পরিবারকে কেউ আর একঘরে করার কথা ভাবেন না। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছিল, গোল বাধল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেল — যক্ষ্মার অবস্থা সত্যি ভয়ঙ্কর! আমরা ভারতীয়রা 'পুনর্জন্ম'-এ বি(াসী তো! তাই প্ে-গ, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, টিবি সব রোগই আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রিত অথবা নির্মূল হয়েও বার বার ফিরে ফিরে আসে। 'Resurgence' কথাটা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বহু ব্যবহৃত একটি শব্দ। 'যক্ষ্মা'-র কথাই যদি ধরি — কেন এই ফিরে আসা? ১৯৬১-র জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ কর্মসূচী (এন টি সি পি) ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হল কেন? এই ব্যর্থতার মোটামুটি কারণগুলো হল — নিয়মিতভাবে ওষুধের সরবরাহ না থাকা, রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা না থাকা, কোনো নির্দিষ্ট তদারকির অভাব।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা রোগের অবস্থা সত্যি ভয়ঙ্কর

সমী(া ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী — (১) সমস্ত পৃথিবীর মোট টিবি বা যক্ষ্মা রোগীর এক তৃতীয়াংশের বাস ভারতে।

(২) আমাদের দেশে ১ কোটি ৪০ ল(মানুষ যক্ষ্মাতে ভুগছেন।

(৩) প্রতিদিন ৬০০০ মানুষ নতুন করে এ রোগের কবলে পড়ছেন।

(৪) প্রতি বছর ৩০,০০০ শিশু যক্ষ্মারোগে বাবা-মাকে হারিয়ে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

(৫) অন্য যে কোনো সংক্র(ামক রোগের ১৪ গুণ বেশি লোক মারা যান যক্ষ্মা রোগে।

এরকম পরিস্থিতিতে শুধু চিকিৎসাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষেরও যক্ষ্মা সম্পর্কে জানা দরকার — মানচিত্র ছাড়া পথটি ভুল না ঠিক তা বোঝা যায় না।

যক্ষ্মা রোগের কারণ, রোগনির্ণয় ও সং(প্ত চিকিৎসা পদ্ধতি

মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামে দণ্ডাকৃতি জীবাণু দ্বারা যক্ষ্মা হয়। এছাড়া মাইকোব্যাকটেরিয়াম বোভিস ও অস্বাভাবিক (atypical) মাইকোব্যাক্টেরিয়াও মানবদেহে সংক্র(ামিত হয়। যদিও নখ ও চুল ছাড়া শরীরের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যক্ষ্মা হতে পারে, শতকরা ৮০ ভাগ যক্ষ্মা সংক্র(মণই ফুসফুসে হয়। এই রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগীর হাঁচি-কাশির ফলে বাতাসে ছোট ছোট কণা (drop-let) ভাসতে থাকে যাতে জীবাণু থাকে। এই জীবাণু প্র(াসের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের শরীরে ঢোকে। সংক্র(মণের ৪-৬ সপ্তাহ পরে শরীরের প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রি(য়া শু(হয় যার ফলে বেশির ভাগ ে(ত্রেই জীবাণুর বংশবৃদ্ধি থেমে যায়। প্রতিরোধ প্রক্রি(য়া সফল না হলে (অপুষ্টি, ডায়াবেটিস, এইচআইভি - এইড্স্ ইত্যাদি কারণে, বা অনেক সময় এরকম কোনো কারণ ছাড়াও) টিবি রোগ দেখা দেয়। রোগ না হলেও কিছু জীবাণু শরীরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, ভবিষ্যতে কোনো কারণে প্রতিরোধ (মতা কমে গেলে ওই জীবাণু আবার সক্রি(য় হয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এক সময়ে শুধু এক্সরে দ্বারাই ফুসফুসের যক্ষ্মা নির্ণয় করা হত, কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে কফ পরী(াকে অনেক বেশি গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ অনেক কম খরচে সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা এই পরী(া করা যায়, নির্দিষ্ট জীবাণু অণুবী(ণ যন্ত্রে দেখা গেলে রোগ নির্ণয় নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, রঞ্জনর(ি দ্বারা (তির আশঙ্কাও নেই। কফে জীবাণু না পাওয়া গেলে এক্সরে করা হয়।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৯১ সালে ভারত সরকার বি(স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পরী(ামূলকভাবে কিছু জায়গায় সরাসরি নজরদারি চিকিৎসা চালু করেন এবং সফল হওয়ার পর ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে পরিবর্তিত বা সংশোধিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (রিভাইজড্ ন্যাশনাল কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বা আর এন টি সি পি) কার্যকরী হয়েছে। ২০০৬ সালের মধ্যে ভারতের সবকটি রাজ্যকেই আর এন টি সি পি-র আওতাভুক্ত(করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে যক্ষ্মার ল(ণ আছে এমন রোগীর (২-৩ সপ্তাহের বেশি কাশি, জ্বর, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি) তিনবার (অতি সম্প্রতি তিনবারের পরিবর্তে ২ বার-এ কমিয়ে আনা হয়েছে) কফের নমুনা পরী(া করা হয়।

যদি যে কোনো একটা নমুনায় (২০০৯ সালের মার্চ মাসের আগে পর্যন্ত দুটো নমুনায় জীবাণু পাওয়া জ(রি ছিল)যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায় তাহলে তাকে 'স্পুটাম পজিটিভ রোগী' হিসাবে ধরা হয়। যদি একটাতেও জীবাণু না পাওয়া যায় তাহলে বুকের এক্সরে করা হয় — যদি বুকের এক্সরে-তে যক্ষ্মা-র ল(ণ পাওয়া যায় তাকে 'স্পুটাম নেগেটিভ রোগী' বলে ধরা হয়। যারা আগে কোনোদিন যক্ষ্মা-র ওষুধ খান নি অথবা মাত্র এক মাসের কম ওষুধ খেয়েছেন তাদের নতুন রোগী হিসাবে ধরা হয়। এইভাবে রোগীদের তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় ও তাদের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওষুধ রোগীর হাতে দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীকে ওষুধ খাইয়ে দেবেন যাতে কোনো ওষুধ বাদ না যায়। তাই একে বলে সরাসরি তদারকি চিকিৎসা (Directly observed Treatment with Short Course Chemotherapy বা DOTS)। একটু বেশি মাত্রায় ওষুধ সপ্তাহে তিনদিন দেওয়া হয় — প্রতি সোম, বুধ ও শুত্র(বার অথবা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার।

* * *

রোগীর কাছে যাওয়া

পরিবর্তিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সবচেয়ে ভালো দিকটি হল এখানে চিকিৎসা ঈ(রের কৃপা-র মতো নিরাপদ দূরত্ব থেকে দামী 'কলম নিঃসৃত' হয়ে রোগীর কাছে আসে না। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার দায়িত্বের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ডাক্ত(ার থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে যিনি হয়ত রোগীর পরিচিত পাশের বাড়ির দিদি কিংবা মাসিমা। এমনকি দায়িত্ব বর্তেছে রোগীর ওপরেও। চিকিৎসার প্রতিটি ধাপে আছে 'কাউন্সেলিং' বা রোগীর সঙ্গে আলোচনা এবং কড়া নজরদারি।

'ডাক্ত(ার থেকে রোগী' এই একাভিমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে 'ডট্স' একটি বহুতলবিশিষ্ট চিকিৎসাব্যবস্থা, যেখানে সমাজ ও রোগীকে যথেষ্ট গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে রোগীকে সুস্থ করার দায়িত্ব চিকিৎসাব্যবস্থার। অর্থাৎ অন্য সব রোগের ে(ত্রে যা হয় — নিয়মমাফিক ডাক্ত(ার ওষুধ লিখলেন, দেখা হল না তা রোগীর ত্র(য়(মতাযোগ্য কি না, এবং রোগী ঐ ওষুধ ঠিকমত খেয়ে সুস্থ হলেন কি না। এখানে বিনামূল্যে নির্ধারিত ওষুধের প্রতিটি 'ডোজ' এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে রোগীর নিরাময় নথিভুক্ত(করার ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা চলাকালীন বার বার কফ পরী(া করে নিশ্চিত হতে হয় চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে কিনা বা অবস্থার অবনতি হচ্ছে কিনা।

লোহার বাসরঘর

'ডট্স' পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এত নি(ছিদ্র করা সত্ত্বেও ফাঁকফোকর কিছু থেকেই যায়। সমগ্রদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ সাফল্যের ল(্য থেকে এখনো অনেকেই দূরে। শু(তে, ১৯৯৮ সালে প্রতি মিনিটে একজন টিবি রোগী মারা যেত — সম্প্রতিকালে তিন মিনিটে দুজন মারা যায় — অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবে ন' বছরে আমরা মাত্র ৩০ সেকেন্ড এগিয়েছি!

আর এন টি সি পি কোন কোন জায়গায় হোঁচট খাচ্ছে দেখা যাক, শু(তেই যে কর্মপন্থা নেওয়া হয়েছিল তার প্রধান উপাদান — রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, উন্নতমানের রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, উন্নতমানের ওষুধের নিয়মিত জোগান, নজরদারি ব্যবস্থা দ্বারা সম্পূর্ণ চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা। সম্প্রতি যোগ হয়েছে এইচআইভি-টিবি সমন্বয়।

উপাদানগুলোর প্রথমটিকেই যদি ধরা যায় — যে ভাবে এক একটা রাজনৈতিক দলের প্রতীক ভোটের আগে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে যায় সেভাবে আর এন টি সি পি সম্পর্কে তথ্য ঘরে ঘরে পৌঁছেছে কি? ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ নেই। উত্তর হল 'না'। নিশ্চিতভাবে পৌঁছয় নি। অন্য রোগীর সঙ্গে টিবি রোগীর তফাৎ এই যে রোগী রোগ চেপে ঘরে বসে থাকে না। কুষ্ঠরোগের ে(ত্রে যেমন 'অসাড় সাদা দাগ' মানুষের দেনন্দিন জীবনে খুব একটা ব্যাঘাত ঘটায় না বলে দীর্ঘদিন রোগ লুকিয়ে রাখার বা গু(ত্ব না দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘ দিন কাশি, রক্ত(পড়া, জ্বর, ওজন ও খিদে কমে যাওয়া — এই উপসর্গগুলো নিয়ে মানুষ কষ্ট পায়, তার জীবিকা ও দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই রোগীকে কোনো না কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থার শরণাপন্ন হতেই হয়। সে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্ত(ার, জানগু(, প্রাইভেট ডাক্ত(ার যাই হোক না কেন। আর এন টি সি পি -তে পাসকরা ডাক্ত(ার ছাড়াও যে সব ব্যক্তি(প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও গ্রামেগঞ্জে ডাক্ত(ারি করে থাকেন, তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহ ট্রেনিং দিয়ে সুশি(ত করার বন্দোবস্ত আছে যাতে এঁরা রোগীকে সঠিক পথ বাত্লাতে পারেন। এমন কি এঁরা যে কেউ এবং যে কোনো 'সুস্থ হওয়া রোগী' ও ইচ্ছা করলে ডট কর্মী হতে পারেন। বাস্তবের মাঠে নেমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ পাস করা ডাক্ত(াররাও এখনো আর এন টি সি পি -তে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন নি। আই ই সি (ইনফরমেশন এডুকেশন কাউন্সেলিং) বা তথ্য-শি(া-আলোচনা ব্যাপারটা জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার একটা মুখ্য অঙ্গ, সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছনোর সবচেয়ে ভালো পথ এটাই। কিন্তু এই জায়গাতেই গাফিলতি দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগে বরাদ্দ অর্থ শেষ করার জন্য হুড়োহুড়ি করে গোঁজামিল দিয়ে আই ই সি করার প্রবণতার চিত্র সব জায়গাতেই এক। ফলে এখনো অধিকাংশ ডাক্ত(ার নিজের ইচ্ছেমতো নিজের বানানো 'Regime'-এ যক্ষ্মার চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। এমন কি নিজের সম্মানদা(ণা হারানোর ভয়ে রোগীকে 'ডট্স'-এর জন্য সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ পর্যন্ত দিচ্ছেন না। রোগী কিছুদিন ওষুধ খেয়ে ভাল বোধ করলেই অথবা টাকায় টান পড়লেই মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দিচ্ছেন — যার পরিণাম — বহু-ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা — এই যক্ষ্মা 'মৃত্যু পরোয়ানা'র সামিল। এখনো বহু নামীদামী ডাক্ত(ার ইচ্ছেমতো দ্বিতীয় শ্রেণীর টিবি-র ওষুধ (যা উপযুক্ত(শর্ত ছাড়া লেখা নিষিদ্ধ) খাওয়ার পরামর্শ লিখে যাচ্ছেন — তা কি কেবলই উদাসীনতা/অজ্ঞানতা নাকি ওষুধ কোম্পানি মারফত মুনাফা লাভের ফন্দি? কোনো নজরদারি আওতার বাইরে রোগীরা এইসব ওষুধ অনিয়মিতভাবে খাচ্ছেন। যার ফল হিসাবে পৃথিবীতে এসে গেছে — এক্স ডি আর (এক্সটেন্ডেড ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টি বি) — মারাত্মক ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা।

ওষুধ প্রতিরোধী

এই এম ডি আর এবং এক্স ডি আর ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। নির্দিষ্ট ওষুধ যথাযথ মাত্রায় ও নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত না খেলে জীবাণুগুলো তাদের গঠন এমনভাবে বদলে ফেলতে সমর্থ হয় যে সেই ওষুধে আর কাজ হয় না। কোনো টিবি-র জীবাণু যদি টিবি-র জীবাণুনাশক আই এন এইচ ও রিফামপিসিন এই দুটি ওষুধের বি(দ্ধে প্রতিরোধ তৈরী করে ফেলে তাহলে তাকে বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা এম ডি আর-টি বি বলে। এই রোগীদের একটানা দু'বছর ধরে দ্বিতীয় শ্রেণীর টি.বি-র ওষুধ —ETHIONAMIDE, CAPROMYCIN, CYCLOSERINE, OFLOXACIN ইত্যাদি খেতে

হয়। এইসব ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া, পার্শ্বপ্রতিক্রি(য়াও মারাত্মক। এম ডি আর টিবি রোগীদের চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি কিছু কিছু জায়গাতে 'ডট্স প-াস' চিকিৎসা চালু করা হয়েছে। 'ডট্স প-াস'-এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার কথাই বলা হচ্ছে, কারণ বাড়িতে ওষুধ খেলে এত বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রি(য়ার ফলে রোগী মাঝপথে ওষুধ ছেড়ে দেয়। সে(ত্রে জীবাণু দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধের বি(দ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে যার ফলাফল কল্পনাতীতভাবে মারাত্মক!

তাছাড়া এই রোগীদের যতটা সম্ভব সমাজ ও বাড়ির লোকের থেকে আলাদা রাখলে এই মারাত্মক জীবাণু কম ছড়াবে। এখানেও দেখা যাচ্ছে আবার সেই চত্র(াকারে 'স্যানেটোরিয়াম' প্রথায় ফিরে যাওয়া! এত কিছু সত্ত্বেও দেখা গেছে শতকরা ৫০ ভাগ এম ডি আর-টি বি রোগী চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে না, যে ৫০ ভাগ পুরো ২ বছর চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে তার মধ্যেও ৫০ ভাগ জীবাণুমুক্ত(হয় না। তাহলে সাফল্যের হার মাত্র ২৫%। স্বাভাবিকভাবেই প্র(উঠে আসে এই এম ডি আর রোগী তৈরি হল কীভাবে? যদি কখনো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তাহলে দায়ী হবেন কে বা কারা? সেই অপরিণামদর্শী ডাক্ত(ার যিনি নিয়মের তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ খাইয়েছেন? সেই স্বাস্থ্যকর্মী যিনি রোগীকে বি(্বাস করে অথবা কাজে ফাঁকি দিয়ে রোগীর হাতে ওষুধের পাতা দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন? সেই রোগী যিনি না জেনে বুঝে ওষুধের পাতাটি ফেলে দেশীমদের দোকানে লাইন দিয়েছেন? অথবা সেই রোগী, যাকে পরিবারে অভাবের তাগিদে ভিন্ রাজ্যে 'মজুর' খাটতে চলে যেতে হয়েছে মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে এবং যার কাছে এই খবরটুকুও পৌঁছয়নি যে, 'তুমি ভারতের যে প্রান্তেই যাও না কেন একই ওষুধ বিনামূল্যে পাবে।'

এই কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ব্যাপারটা আর শুধুমাত্র কল্পনাপ্রসূত পর্যায়ে নেই। ২০০৫ সালে বি এন পি+ (Bengal Network of People living with HIV)-এর এক সদস্যের এম ডি আর-টি বি ধরা পড়ে এবং তিনি সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থাকে এর জন্য দায়ী করেন কারণ তিনি কয়েকবার চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে ওষুধ পাননি এবং তাকে ঠিকমতো যক্ষ্মার ওষুধ খাওয়ানো হয়নি। বি এন পি + এর সত্রি(য় কর্মীরা এই ঘটনার বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানান, বিভিন্ন এন জি ও-র সাহায্যে এবং নিজের মনের জোরে এই রোগী ২০০৫- ২০০৭— পুরো দু'বছর চিকিৎসা চালান। এই দু'বছর এইডস ও যক্ষ্মার চিকিৎসার দ(ণ তাকে প্রতিদিন ৫৩টি করে ওষুধ খেতে হয়েছে এবং মোট খরচ পড়েছে টাকার হিসেবে ৩,৬০০ মিলিয়ন। আশা করি পাঠক এম ডি আর-টি বি-র ভয়াবহতা সম্পর্কে এবার আন্দাজ করতে পারছেন।

এম ডি আর যদি 'মৃত্যু পরোয়ানা' হয় এক্স ডি আর তাহলে কি?

দ্বিতীয় শ্রেণীর যক্ষ্মার ওষুধেরও যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে এমন ভয়ানক প্রতিরোধী যক্ষ্মার জীবাণু এসে গেছে যারা শুধু আই এন এইচ ও রিফামপিসিনই নয় — দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধের বি(দ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যে কোনো একটি ফ্লুরোকুইনোলোন ও যে কোন একটি ইঞ্জেকশন যোগ্য ওষুধ (যথা — Amikacin, Kanamycin, Capreomycin) প্রতিরোধী হলেই তাকে ভয়ানক ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বলা হয়। এখনই যথেষ্ট সতর্ক না হলে এই জীবাণু সমগ্র মানব সভ্যতাকে একটা প্র(চিহ্নে(র মুখোমুখি দাঁড় করানো (মতা রাখে।

গোদের উপর বিষফোঁড়া —এইচ আই ভি-এইড্স ও টি বি

এইচ আই ভি-এইড্স ও টি বি রোগ একে অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত। যে সুযোগসন্ধানী জীবাণুটি এইড্স রোগীকে সবচেয়ে বেশি আত্র(মণ করে ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তা হল যক্ষ্মা। একজন সাধারণ লোকের চাইতে এইড্স্ রোগীর যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ ভাগ বেশি। প্রতিরোধী যক্ষ্মার সম্ভাবনাও এইড্স্ রোগীদের বেশি। ভারতে ৫ মিলিয়নের বেশি এইড্স্ রোগীর বাস। এই সব কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই এইচ আই ভি-এইড্স ও টি বি-র সমন্বয় কর্মসূচি চালু হয়েছে। উভয় রোগের (ত্রেই অপরটির উপস্থিতি যাচাই করে নেওয়া অপরিহার্য।

যক্ষ্মা — এক আর্থ-সামাজিক রোগ

আর এন টি সি পি-তে চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, নজরদারি সব কিছু খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধার সব দিক ভেবে সাজানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু যক্ষ্মার মত একটি রোগ শুধু ওষুধ খাইয়ে কতটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে সন্দেহ আছে। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে ১৯০০ সালে ১ লাখ মানুষের মধ্যে ১৯৯ জন যক্ষ্মা রোগে মারা যেতেন, ১৯৮০-তে তা নেমে আসে ০.৫ জনে। ওদেশে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর হার কমা শু(হয়েছিল মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির মাধ্যমে। দরিদ্র দেশে যেখানে অনাহার অর্ধাহার অপুষ্টি মানুষের নিত্যসঙ্গী, সেখানে রোগ প্রতিরোধ (মতা কমে যায়, একটি ছোট ঘরেই যেখানে পরিবারের সবাই মাথা গুঁজে থাকে — রোগটি তাড়াতাড়ি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে আছে শি(া ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাব। এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য যে বিস্তৃত কর্মসূচির প্রয়োজন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শু(করার সময় এসেছে। পে(তে ডট্স-এর সঙ্গে একটা পুষ্টিকর খাবার জোগানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল — এতে সাফল্য তাড়াতাড়ি এসেছে। আমাদের দেশে এরকম কোন পদ(প এখনো নেওয়া হয়নি। তবে কোন কোন পঞ্চায়েত রোগীকে ওষুধ সম্পূর্ণ করতে উৎসাহিত করার জন্য চিকিৎসা শেষে রোগীকে কিছু 'থোক টাকা'র অনুদান দিচ্ছেন — ব্যাপারটা মন্দ নয়।

যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সমাজের সব মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার কথা বার বার বলা হচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন , কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সবাইকেই এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এত কিছু সত্ত্বেও 'চোর' সন্দেহে 'গণপিটুনি' দেওয়ার সময় অথবা 'ডাইনি' সন্দেহে নিরীহ বৃদ্ধাকে মেরে ফেলার সময় যে 'ঐক্যবদ্ধ জনচেতনা' দেখা যায়, তার এক শতাংশ উৎসাহও যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের (ত্রে মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত দেশের কোণায় কোণায় মানুষ যখন রাজনীতি নিয়ে খুনোখুনিতে ব্যস্ত — ছোট্ট দণ্ডাকৃতি জীবাণুগুলো কোনো ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমারেখার তোয়াক্কা না করে, কোনো ল্যান্ডমাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে নিঃশব্দে মৃত্যুজাল বিছিয়ে চলেছে। আর এন টি সি পি ও ডট্স হল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের 'লাস্ট ট্রেন' যা ফেল করলে সামনে যে অন্ধকার রাত্রি তারপর আর ভোরের আলো ফুটবে কিনা সন্দেহ!

যাত্রীরা সেকথা জানে না — তারা তো ঘুমোয় নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়। হে মহাচালক, তুমিও ঘুমোও নাকি, নির্বোধ আঁধারে চোখ ঢেকে!

ভিজিটিং আওয়ারের ভাল-মন্দ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

আত্মীয়-পরিজন কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে উদ্বেগে, কর্তব্যের খাতিরে, কিংবা 'পাশে আছি'—এই অভয় দিতে আমরা ছুটে যাই দেখতে। বাড়িছাড়া হয়ে, অপরিচিত লোকজনদের মধ্যে থাকা রোগীদের সঙ্গে দেখা করলে তাদের ভাল লাগে। তারা মনে বল পায়। 'ভিজিটিং আওয়ার্স' শু(হয়ে গেলেও বাড়ির কেউ না এলে রোগী ছটফট করে, একা বোধ করে। তেমন নিঃসঙ্গ রোগী অভিমানে, দুঃখে বিষাদ দৃষ্টিতে অন্যের বাড়ির লোকজনকে দেখে। ভিজিটিং আওয়ারের পরে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, এমনটিও শোনা যায়! এত কিছুর পরেও প্র(ওঠে, হাসপাতালে থাকা রোগীদের দেখতে যাওয়ার হুজুগ কি ভাল? বাইরের নোংরা, জীবাণুমুক্ত(পোশাকে তার কাছে যাওয়া, তার বিছানায় বসে গুলতানি করায় কি আখেরে প্রিয়জনটিরই (তি করি না? অবশ্যই করি। কীভাবে বন্ধ করা যায় এই বিপজ্জনক প্রবণতা, তানিয়ে রোগী এবং তার আত্মীয়-পরিজন — কর্তব্য সারতে নয়, প্রয়োজনেই দুজনের ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। হাসপাতালে রোগীকে দেখতে যেতে হয় অনেককেই। তাই বিপদটার কথা মাথায় রাখা এবং সেই বুঝে চলা আমাদের সবারই উচিত। বোঝানো উচিত রোগীকেও। যাতে সে ভুল না বোঝে।

না, এখানে জেলে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার 'ভিজিটিং আওয়ার' নয়, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের সঙ্গে দেখা করার যে সময় ঐ 'ভিজিটিং আওয়ার'-টিই আমাদের আলোচ্য।

এখন হাসপাতাল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যে পর্যায়েই পৌঁছক না কেন, 'হাসপাতাল' কথাটির সঙ্গে সেবা ও আতিথেয়তার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। ইউরোপে মধ্যযুগে 'হসপাইট' নামে একটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যার অর্থ তীর্থযাত্রী। দুর্গম পথে এইসব দূরদূরান্তের তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হত যে অতিথিশালায় তার নাম হয় হসপিটালিয়া। এখানে বিধ্বস্ত তীর্থযাত্রীরা বিশ্রামই করতেন না, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাও করা হত। এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি শব্দ 'হসপিটালিটি', যার অর্থ আতিথেয়তা এবং 'হসপিটাল', বাংলায় 'হাসপাতাল'। এখনকার অধিকাংশ হাসপাতালে এই আতিথেয়তা আর সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারটা কতটা আছে বা নেই—তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

শু(র ঐ হসপিটালিয়া থেকে আধুনিক হাসপাতালে পৌঁছনোর পথপরিত্র(মায় নানা বিবর্তন-পরিবর্তন হয়েছে। ওঝা গুনিন ঝাড়ফুঁক বা অপদেবতা তাড়ানো এবং পাশাপাশি ওষধি গাছগাছড়া মাটি ধাতু সূচ ইত্যাদি থেকে চিকিৎসারও বিবর্তন ঘটেছে। রোগের সৃষ্টি সম্পর্কে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যও জানা গেছে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী বা প্যারাসাইট—এগুলি রোগের পেছনে কী ভূমিকা পালন করে তা পরিষ্কার হয়েছে। জীবাণুসংক্র(মণ কীভাবে প্রাণঘাতী অবস্থার সৃষ্টি করে তাও জানা গেছে। আর মূলত এই জীবাণুসংক্র(মণ ন্যূনতম করার উদ্দেশ্যেই আধুনিক হাসপাতালে রোগীকে দেখতে আসা লোকজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিনের শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময়টিই ভিজিটিং আওয়ার।

হাসপাতালে যে সব রোগী ভর্তি থাকেন তাঁদের মোটা দাগে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের রোগীর প্রাণ নিয়ে টানাটানির অবস্থা থাকে। তাঁদের বাড়ির লোকজনকে সব সময় হাসপাতাল চত্বরে থাকতে বলা হয়, যাতে প্রয়োজনে পাওয়া যায়। কিন্তু রোগীর কাছে যেতে দেওয়া হয় ঐ নির্দিষ্ট সময়েই। এই সব রোগীদের অনেককেই হাসপাতালে বিশেষভাবে তৈরি জ(রি পরিষেবার ঘরে রাখা হয়, যেমন আই টি ইউ, আই সি ইউ অথবা আই সি সি ইউ। এই ঘরের ভেতর বাড়ির লোকজনের ঢোকা আরো কিছু নিয়ন্ত্রিত করা হয়, দিনে সাধারণত একবার, তাও যথেষ্ট সাবধানতা নিয়ে কিংবা আদৌ নয়। আরেক ধরনের রোগীদের অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল বা ঐভাবে আলাদাভাবে বিশেষ ঘরে রাখার দরকার হয় না। এঁদের (ত্রে দিনে সাধারণত দুবার, দুপুরে ও সন্ধ্যাবেলা বা বিকেলে, ভিজিটিং আওয়ার থাকে। এবং ঐ সময় দুজন, কখনো বা মাত্র একজনকে রোগীর কাছে যেতে দেওয়া হয়।

সাধারণত এই ধরনের নিয়ম থাকলেও নানা হাসপাতালে নানারকম নিয়ম থাকে। কোথাও আট বছরের কম বয়সী শিশুদের (ত্রে মাকেও শিশুর সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে বলা হয়। কোথাও দুপুরে শুধু একজনকে ঢুকতে দেওয়া হয়। কোথাও দিনে দুবার নয়, মাত্র একবারই ভিজিটিং আওয়ার থাকে। আসলে ভিজিটিং আওয়ার নিয়ে ঐ ধরনের কঠোর কোনো নিয়মবিধি নেই। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পাস করা ডাঃ রঞ্জন ভৌমিক ও সেবন্তী মুখার্জি জানালেন, ঐ পাঠ্যত্র(মে ভিজিটিং আওয়ার নিয়ে বিশেষ কিছু বলা নেই। সাধারণভাবে আই টি ইউ-তে দিনে একবার এবং সাধারণ বিভাগে দিনে দুবার ভিজিটিং আওয়ার-এর কথা বলা হয়। তবে এর নানা নিয়মবিধি ও খুঁটিনাটি স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপ(ই ঠিক করে।

এই পরিপ্রে(তে ভিজিটিং আওয়ার-এর ব্যবস্থা করার উপযোগিতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রথমত ভিজিটিং আওয়ারের কড়াকড়ি যদি না থাকে, তবে দিনে রাতে যখন তখন রোগীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতরা যতজন খুশি হাসপাতালে ঢুকতে থাকবে। এতে শুধু ভেতরটা নোংরা

এবং বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসে জর্জরিত হবে তাই নয়, রোগীর চিকিৎসা করাই দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। হাসপাতাল আর হাসপাতাল থাকবে না, বাজারে পরিণত হবে। অন্যদিকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রোগী যাতে মানসিক হতাশায় না ভোগে তার জন্য দিনে অন্তত একবার প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবারদাবার ইত্যাদি সরবরাহ করারও প্রয়োজন হয়।

রোগীর এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই রোগীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কিন্তু অবশ্যই মনে রাখা দরকার, রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। যেখানে রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত হয়, এমন কোনো কিছু করা নিজেদের রোগীর প(এবং অন্য রোগীদের প(ও (তিকর ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে ভিজিটিং আওয়ারের কড়াকড়ি সম্পর্কিত হাসপাতালের বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলাই কাম্য। রোগীর কাছে বারবার বা বেশিজন গেলে চিকিৎসা পরিষেবার পরিবেশ ব্যাহত হয়, কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসও ভেতরে ঢোকে। প্রিয় রোগীর সঙ্গে বিপদ বাড়ে অন্য রোগীদেরও।

কিন্তু অশি(ত বা স্বল্পশি(ত মানুষ তো বটেই অনেক শি(ত মানুষজনও এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে চান না। ঝাঁ চকচকে আধুনিক হাসপাতালে কড়াকড়ি থাকলেও, বিশেষত সরকারি হাসপাতালগুলিতে ও কিছু নার্সিংহোমে রোগীর দর্শনার্থীদের জন্য কঠোর নজরদারির যথেষ্ট অভাব থাকে। এই সুযোগে নির্ধারিত ভিজিটিং আওয়ারে তো বটেই, অন্য সময়ও দুজনের বেশি দর্শনার্থী রোগীর কাছে ভিড় জমায়। দেখা করতে না দিলে চোটপাট শু(করে, কখনো বা দারোয়ানকে দুপাঁচ টাকা দিয়ে বশ করার চেষ্টা চলে। কোনো নেতৃস্থানীয় ভর্তি হলে তো কথাই নেই। দর্শনার্থীর স্রোত লেগে যায়। এছাড়া আছে পাড়ার অর্ধ বা পূর্ণ মস্তানদের ব্যাপারটি। এদের কেউ ভর্তি হলে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দিনে রাতে হাসপাতালে ঢোকাটাকে নিজেদের অধিকার হিসেবেই গণ্য করে। এর ফলে পরো(প্রত্য(ভাবে রোগীর চিকিৎসাই যে ব্যাহত হয় ঐ বোধ আর থাকে না। আর চিকিৎসার একটু কিছু খুঁত পেলে বা পান থেকে চুন খসলেই শু(হয় মারধর ভাঙচুর।

দর্শনার্থীরা প্রায়শই ভিজিটিং আওয়ারে বাড়ির পরিবেশটাই যেন ফিরিয়ে আনে। কেউ রোগীর বিছানায় বসে খোশগল্প করছে, কেউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সরকারি-আধাসরকারি হাসপাতালে তো বটেই, অনেক নার্সিং হোমেও চিকিৎসক ও সেবিকাদের এ ব্যাপারে তিক্ত(অভিজ্ঞতা আছে।

যেমন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের একটি হাসপাতালের ডেপুটি চিফ মেডিক্যাল অফিসার ও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ আরতি চ্যাটার্জী জানালেন, তাঁদের হাসপাতালে নিয়মমত ঐ দুপুরে ১১টা থেকে ১২টা ও বিকেলে ৪টে থেকে ৬টা রোগীর কাছে বড়জোর দুজনের যাওয়ার জন্য ভিজিটিং আওয়ার থাকলেও, অনেক সময় ১০ থেকে ১২ জনও যায়। অবি(াস্য মনে হলেও সত্যি। বিশেষত ইউনিয়নের নেতা বা আধানেতাদের (ত্রে এটি প্রকটভাবে দেখা যায়। এবং তাঁরা গিয়ে রোগীর বিছানায় বসা থেকে শু(করে, যাবতীয় অ-হাসপাতাল সুলভ ত্রি(য়াকাণ্ড চালিয়ে যান। এর ফলে ঐ রোগী এবং পাশের রোগীরও যে (তি হয় তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত কোনো রোগীকে হয়ত ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এত দর্শনার্থীর 'শুভ কামনায়' ঐ ঘুমের বারোটা বাজে(যে উদ্দেশ্যে তা দেওয়া তা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়।

দ(ণ কলকাতার দিকে অবস্থিত সরকারি এক জেলা হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসমঞ্জ বি(াসও ভিজিটিং আওয়ার নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালেন। তিনি জানান, সাধারণত দিনে দুবার ভিজিটিং আওয়ার থাকে। দুপুরে ১১টা থেকে ১২টা একজনের জন্য এবং বিকেলে ৪টে থেকে ৬টা দুজনের জন্য কার্ড দেওয়া হয়। এছাড়া যে সব রোগী হাসপাতালের খাবার না খেয়ে বাড়ির খাবারের জন্য বিশেষ অনুমতি নেন (লাল কার্ড), তাঁদের জন্য সকালে, দুপুরে ও রাত্রে সন্ধ্যার নির্দিষ্ট ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে মোট তিনবার একজনকে রোগীর কাছে খাবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় দুজনের বেশি দর্শনার্থী রোগীর কাছে ভিড় জমায়। কখনো বা দারোয়ানের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে, কখনো তাকে 'চা-খাওয়ার জন্য' দুচার টাকা দিয়ে, আবার কখনো ভেতর থেকে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরের অপে(মাণ কাউকে কার্ড পাচার করে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি দর্শনার্থী ঢুকে পড়ে। এবং ব্যাপারটিকে বেশ কৃতিত্ব হিসেবেই তারা গণ্য করে। তিনি জানান এর ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা যে বিপজ্জনকভাবে (তিগ্রস্ত হয় ঐ বোধ এঁদের থাকে না। বিশেষত হাসপাতালের ভেতরটা প্রচণ্ড নোংরা হয়। তাঁর মতে মন্দির-মসজিদ-গুরদোয়ারায় ঢোকার সময় যেমন বাইরে জুতো খুলে রাখা হয়, তেমনি হাসপাতালে ঢোকার সময়ও বাইরে জুতো খুলে যাওয়ার কঠোর নিয়ম করা উচিত। এছাড়া ভিজিটিং আওয়ারে বেশি লোকজন থাকলে চিকিৎসাও ঠিক মত করা যায় না। ঐ দুঘণ্টায় কোনো রোগীর অবস্থা খারাপ হতেই পারে, বেশি লোকজনের উপস্থিতিতে তা হয়ও। আর ভিজিটিং আওয়ারে ইনডোর-এর সিস্টাররাও একটু ঢিলে ঢালা থাকেন। এমন কি 'আই টি ইউ'-এর মত জ(রি পরিষেবা কেন্দ্রের ডাক্ত(াররাও ঐ সময় একটু বিশ্রাম নিতে থাকেন। সব মিলিয়ে ভিজিটিং আওয়ারের দীর্ঘ সময় রোগীর দেখভালের (ত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকেই। বেশি লোকজনের উপস্থিতিতে এই শিথিলতা আরো বাড়ে।

কলকাতার একটি আধা সেবামূলক নার্সিংহোমের অভ্যর্থনা বিভাগের লোকজন জানালেন, তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্রটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে ভিজিটিং আওয়ারের কড়াকড়ি যথেষ্ট। দিনে শুধু বিকেলে একসঙ্গে শুধুমাত্র দুজনকেই ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। ইনডোর-এ ঢোকার মুখে নিরাপত্তাকর্মী তথা দারোয়ান দুজন দর্শনার্থীর কার্ড নিজের কাছে জমা নিয়ে নেন। রোগীর পরবর্তী দর্শনার্থী কেউ এলে ভেতরে থাকা একজনকে বেরিয়ে এসে তাঁর কাছ থেকে নিজের কার্ড নিয়ে বাইরের জনকে দিতে হয়, তবেই ঐ ব্যক্তি(কার্ড জমা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। ফলে কখনোই ভিজিটিং আওয়ারে এক জন রোগীর জন্য দু'জনের বেশি দর্শনার্থী ভেতরে থাকে না। এছাড়া নবজাত শিশুদের কাঁচে ঘেরা আলাদা ঘরে রাখা হয়। ফলে দর্শনার্থীরা নবজাত শিশুর কাছাকাছি আসতে পারে না, বাইরে থেকে দেখেই শান্ত থাকতে হয়। একইভাবে আই টি ইউ, আই সি সি ইউ-তে ভর্তি থাকা রোগী, সদ্য অস্ত্রোপচার হওয়া রোগী—এঁদের জন্যও একই ব্যবস্থা (এখানে যা করা হয় আধুনিক ও অনেক বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এবং নজরদারি ও পরিকাঠামোর অভাবে যা অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালে কঠোরভাবে করা সম্ভব হয় না)।

কলকাতার সবচেয়ে নামী ঐতিহ্যমণ্ডিত সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের শি(া প্রতিষ্ঠানের প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ দাস বি(াস এই ভয়াবহ দিকটির প্রতি বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের হাসপাতালে সব সময়েই ভিজিটিং আওয়ার।' যখনই

হাসপাতালে যাওয়া যাক না কেন দেখা যাবে ওয়ার্ডে বেশ কিছু বাইরের লোক রয়েছে। কেউ রোগীর বিছানায় বসে, কেউ বা পাশে দাঁড়িয়ে, আবার কেউ নানা খোঁজখবর নিতে ব্যস্ত। এরা যে নানা জীবাণু ও ভাইরাসের বাহক তাতেও সন্দেহ নেই, যেমন তিনি বললেন সাম্প্রতিক সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের কোনো বাহকও ইনডোরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে কিছু ভাইরাস গচ্ছিত রেখে চলে যেতেই পারে। হিসাব বহির্ভূত এত দর্শনার্থী শুধু ওয়ার্ডের ভেতরটা নয়, নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা বাথ(ম, জল ইত্যাদিও ব্যবহার করে। বিশেষ গ্রিন কার্ড নিয়ে যারা সবসময় রোগীর কাছে থাকে, তারাও এই চাপ সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে ভিজিটিং আওয়ার-এর ব্যাপারটা যেন একটা প্রহসনে পরিণত হয়। তিনি বিদেশের হাসপাতালেও গেছেন, সেখানে কিন্তু আকাশপাতাল তফাত। চিকিৎসক হলেও আলাদা কার্ড করে হাসপাতালে ঢুকতে হয়। ডাঃ দাসবি(াস অন্য একটি দিকেরও উল্লেখ করেন। আই সি সি ইউ-তে কোনো দর্শনার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্রান্তিক অবস্থার হৃদরোগীর প(তার দরকারও হয়। কিন্তু প্রায়শই যা হয়, দু'চারদিন পরে রোগীর অবস্থা যখন স্থিতিশীল, তখনও এই ব্যবস্থা বহাল থাকে। অথচ ঐ সময় রোগীর প্রয়োজন হয় কিছু মানসিক আ(াস, আত্মীয় প্রিয়জনের সান্নিধ্য। আমাদের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থায় চিকিৎসক, নার্স বা হাসপাতালের অন্য কেউ এই দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবেনই না। অথচ বিশেষ যে সব (ে ত্রে রোগীরা প্রিয়জনের সান্নিধ্য পান না, তখন হাসপাতালেই সেই ঘাটতি পূরণ করার পরিবেশ থাকা দরকার। কিন্তু বিশেষত সরকারি হাসপাতালে রোগীর যে চাপ, তাতে তার সুযোগ কতটা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে। তবে, পাশাপাশি ব্যাপারটা কেউ মাথায়ই রাখেন না, ঐ মানসিকতাটাই নেই। আন্তরিকতা ও মানসিকতা থাকলে তার জন্য সময় বেশি খরচ করার প্রয়োজন হয় না, দুচারটে কথা, ছোট ছোট আচরণেই তা করা যায়।

অন্যদিকে সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে ঐ অর্থে কোনো ভিজিটিং আওয়ারই নেই। এ সব হাসপাতালে এর জন্য কোনো নিরাপত্তা কর্মীই নেই। দ(িণ চব্বিশ পরগণার এক গ্রামীণ হাসপাতালে কাজ করা ডাঃ শুভ্রাশ্রী মুন্সি জানালেন, নিরাপত্তা কর্মী থাকেন মহকুমা হাসপাতাল স্তর থেকে। ফলে ৩০-৩২ বেডের গ্রামীণ হাসপাতালের ইনডোরে দর্শনার্থীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যে যখন খুশি আসছে, যত(ণ খুশি থাকছে, এমন কি যা খুশি করছে। সত্যিকারের রোগী থেকে ভিখিরিরাও ভর্তি হয়, কয়েকদিন খাবার আর আশ্রয়ের আশায়। এমনিতেই পরিকাঠামো নড়বড়ে, সামর্থ্য সীমিত। তার ওপর এই অবস্থায় হাসপাতালের ভেতরের পরিবেশ যে কি হয় তা কহতব্য নয়।

সব মিলিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থায় ভিজিটিং আওয়ারের মত 'সামান্য' একটি বিষয় নিয়ে কিছু প্রাথমিক ভাবনা ও আলোচনার প্রসঙ্গে নানা দিকই চলে আসে। এমনিতে আমাদের দেশে সরকারি হাসপাতাল তথা চিকিৎসা পরিষেবা বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষের একমাত্র ভরসার স্থল। সংখ্যালঘু সচ্ছল ও ধনীদের একটি (ুদ্রাতি(ুদ্র অংশই সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার সাহায্য নেন। এই অবস্থায় সরকারি হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে চাপ থাকে প্রচণ্ড। উপযুক্ত(অর্থ, কর্মী, পরিকাঠামো, সদিচ্ছা, আন্তরিকতা—সব কিছুরই অভাব আছে। অন্যদিকে আছে রোগী জনসাধারণের অসচেতনতা, অশি(া, দারিদ্র্য, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও চূড়ান্ত অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা যা ঐ অভাবজনিত সমস্যাকে আরো জটিল ও তীব্র করে তোলে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিজিটিং আওয়ারের সরকারি নিয়মকে প্রহসনে পরিণত করার মধ্যেও। এর ফলে (তি যে হয় রোগী তথা নিজেদেরই, এই বোধটুকুই বিলুপ্ত।

একুশে ফেব্রুয়ারি

পূরবী ঘোষ

স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ার সময়ই—

'আমার ভাইয়ের রক্তে(রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?'

গানটি কোথায় যেন শুনেছিলাম। সুর এবং কথার সমন্বয়ে গানটি সেদিন থেকে কানে এবং একই সঙ্গে মনেও গেঁথে গিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই গানের উৎস খুঁজতে গিয়েই পেয়েছিলাম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ গর্জে উঠেছিল। এবং তারা দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে, ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জীবনপণ করে রাস্তায় নেমে এসেছিল। রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত আর সফির রক্তে(সেদিন রাঙা হয়ে গিয়েছিল ঢাকার রাজপথ। পুলিশের গুলি কেড়ে নিয়েছিল তাঁদের মুখের কথা। ছটফটে, তরতাজা পাঁচটি প্রাণ সেদিন ঢাকার রাজপথে লুটিয়ে পড়েছিল, হাতে ঝাণ্ডা আর মুখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে। সারা পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি বি(বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গর্জে উঠেছিল। 'মানছি না', মানবো না'—এই সোচ্চার ঘোষণায় সেদিন ঢাকার আকাশ বাতাস ভরে উঠেছিল। আর পুলিশ তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লাঠি আর বন্দুকের নলের সাহায্যে এই ঘোষণা, এই দাবিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। ত(ণ রক্তে(রাঙা হয়ে উঠেছিল ঢাকার রাজপথ। পেরেছিল তারা পাঁচটি প্রাণের রক্তে(ঢাকার রাজপথকে রক্ত(াক্ত(করতে পেরেছিল। কিন্তু থামিয়ে দিতে পারেনি সেই দাবিকে। রক্ত(স্নাত রাজপথে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিল হাজারো রফিক, সালাম, বরকতা। তারা গেয়ে উঠেছিল —

'আমার ভাইয়ের রক্তে(রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি?'

শেষ পর্যন্ত তারা আদায় করেছিল দাবি। তাদের মাতৃভাষা বাংলাই হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা। সেই থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ওই দেশের শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের উর্দু শাসনকে ভেঙে জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের। আমাদের নিকট প্রতিবেশী আজকের বাংলাদেশ।

এ তো গেল ইতিহাস। এই ইতিহাস জানার পর থেকে মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল একটি সুপ্ত বাসনা। ভাষার জন্য আন্দোলন করা, আর প্রাণ দেওয়া সে দেশের ছাত্রসমাজের আবেগকে কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখার, তাদের শহিদ দিবস পালনের শরিক হওয়ার।

দীর্ঘদিন ইচ্ছাটা মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে একটা সুযোগ এসে গেল বাংলাদেশে যাওয়ার। দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পা রাখলাম সেই বাংলাদেশে, যে দেশটাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিদেশ মনে হয়নি। একটা মাত্র লোহার বেড়া আর কয়েকজন উর্দিধারী সীমান্তর(ী দিয়ে আলাদা করা দেশটা কেন যে পরদেশ হল, তার উত্তর আজও খুঁজে পাইনি।

যাই হোক বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা গেল। একই বাড়ির মধ্যে তিনটি ঘরে তিন পরিবার। দুটি মুসলমান আর একটি হিন্দু পরিবার। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কোথায় তাদের আলাদা অস্তিত্ব? একই কলের জল খাওয়া হচ্ছে। একটি চানঘর, বালতি মগ সবাই ব্যবহার করছে। আমরা অতিথিরা পৌঁছানোর পর অতিথি সৎকারের দায় বর্তেছে সবাইয়ের ওপর। আমাদের জন্য শোবার বন্দোবস্ত করা, ফল কেটে দেওয়া ইত্যাদি দেখে একবারও মনে হয়নি যে আমরা বিদেশে এসেছি বা ভিন্ন ধর্মের মানুষের ঘরে শুচ্ছি, বসছি ইত্যাদি। দুর্ভাগ্য আমাদের মানতে না চাইলেও মানতেই হবে ওদেরকে পরদেশী, ভিন্নধর্মী বন্ধু বলে।

আন্তরিক আতিথেয়তার আস্বাদ নিতে নিতে কেটে গেল দু-চারটি দিন। অবশেষে এসে গেল সেই কাঙ্খিত একুশে ফেব্রুয়ারি-র শহিদ দিবস। আমার দেশে আমি এমন শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান কখনও দেখিনি। এমন আবেগ, উদ্দীপনা, আন্তরিকতা নিয়ে শহিদ দিবস পালন বোধ হয় বাংলাদেশেই হয়। ২০ তারিখ রাত ১২টা ১মিনিটে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথম শহিদ বেদিতে মাল্যদান করলেন। ঐ মাঝরাত্রে একুশের শহিদ বেদিকে দেখে মনে হল না যে এখন মাঝরাত। মানুষের ঢল দেখে মনে হচ্ছিল রফিক, সালাম—সার্থক তোমাদের জীবনদান। বাংলাদেশের মানুষের মনে তোমরা চিরজীবী।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের স্রোত আরও বেড়েছে। দূর দূর জেলা থেকে মানুষজন আসছে। বাবার হাত ধরে ৫ বছরের নিষাদ, দাদুর কাঁধে চেপে ৩ বছরের সিফাদ থেকে শু(করে গ্রাম থেকে আসা বোরখা পরা গৃহবধূ, বি(বিদ্যালয়ে পড়া আধুনিক সজ্জায় সুসজ্জিতা ত(ণী ছাত্রী, সবাই চলেছে হাতে ফুল নিয়ে শহিদ বেদিতে মালা দেবে বলে। কোর্টের উকিলবাবুরা , হাসপাতালের ডাক্ত(ারবাবু, নার্স দিদিভাইরা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শ্রমিক, সবাই পায়ে পা মিলিয়ে চলেছে বেলা যত বেড়েছে, জনস্রোত ততই বেড়েছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে সেই গণমিছিল।

সেই মিছিলে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম যে এত মানুষ চলেছে, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। কিছু গাড়িকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। কিন্তু নেই কোনও চীৎকার-চেঁচামেচি, কোনও বিশৃঙ্খলা-ঠেলাঠেলি। হাতে ফুল, মালা ইত্যাদি নিয়ে শুধুই এগিয়ে চলা। চলতে চলতে চোখে পড়েছে অজস্র দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ব্যানার, এমন কি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, সবই লেখা বাংলায়। আর সেগুলোতে লেখা আছে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের লেখা থেকে নেওয়া নানান উদ্ধৃতি। রবীন্দ্রনাথ, নজ(ল তো আছেনই, আরও আছেন সেই সব কবি সাহিত্যিক যাঁদের আমরা পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলাভাষীরা প্রায় ভুলতে বসেছি। নবীনচন্দ্র সেন, ঈ(রচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। মন্ত্রিসভার বিরোধী দলের নেত্রী থেকে শু(করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত সবাই সেই মিছিলের সারিতে পা মিলিয়ে হেঁটে হেঁটেই শহিদ বেদিতে মালা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল না কোনও বন্দুকধারী দেহর(ী বা হুটার বাজানো লালবাতি জ্বালানো গাড়ি।

হাঁটছি আর দেখছি মাঝে মাঝে কথা বলছি রাজসাহী বি(বিদ্যালয় ও আরও অনেক মহাবিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। ভারত থেকে এসেছি শুনে ঐ পথ চলা অবস্থাতেই কাঁধে হাত রেখে, কেউ বা হাত ধরে আমার সঙ্গে ছবি তোলার ব্যাপারে তাদের যে আগ্রহ দেখেছি তা আমাকে অভিভূত করেছে। হঠাৎ কানে এসেছে একটা পরিচিত গানের কলি—'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই'—স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছি আমাদের প্রতুলদার গান। বাংলাদেশের শহিদ দিবস উদ্‌যাপনে প্রতুলদার গলার গান আমাকে মোহিত করেছে, আপ্‌ুত করেছে।

অবশেষে শহিদ বেদির সামনে পৌঁছে ফুল দিলাম শহিদ বেদিতে। বহুদিনের স্বপ্নপূরণের সাফল্যে তখন আমি পুলকিত। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বি(বিদ্যালয় চত্বরে খোলা আকাশের নীচে চলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে বসে প্রাণভরে, কানভরে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ, নজ(ল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গান। আর ঘরে ফিরতে ফিরতে ভেবেছি, প্রাণ দিয়ে লড়ে জয় করেছে বলেই কি বাংলাভাষার ওপর ওদের এত টান, এত মায়া মমতা?

'ডান্স বাংলা', 'লিট্‌ল চ্যাম্প' ইত্যাদির দাপট আর সর্বগ্রাসী হিন্দি সিরিয়াল আর সিনেমার আগ্রাসনে আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলালরা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন। অথচ ওরা ওদের গানে কবিতায় আলোচনায় এঁদেরকে ধরে রেখেছে অতি যত্নে আর অসীম ভালোবাসায়। ভাবছি আর ভাবছি কেন এই তারতম্য? লড়াই করে, প্রাণ দিয়ে জয় করেছে বলেই কি ওরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মাতৃভাষাকে? আর আমরা হেলাভরে ঠেলে দিয়ে ছুটেছি চটুল হিন্দি সংস্কৃতির পিছনে!

(আমাদের শহিদ দিবস পালন আর ওদের শহিদ দিবস উদ্‌যাপনে কত তফাত। আমাদের দেশে শহিদরাও রাজনৈতিক রঙ অনুযায়ী বিভক্ত(হয়ে আছেন। যাঁরা তা হননি, তাঁদের মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপনে হয় দলের প্রচার অন্যদলের প্রতি দোষারোপ, কট্া(। এই উদ্‌যাপনে আর যাই থাক, শহীদের মর্যাদা থাকে না।)

আয়লার (তি এবং (ত

ভবেশ দাশ

ঝড় বয়ে গেছে আজ চার মাস হতে চলল। কেমন আছেন সুন্দরবনের মানুষেরা? ঝড় তাঁরা অনেক দেখেছেন। অনেকবার ঘর ভেঙেছে। পলকা বাঁধ কোটালের ধাক্কায়ও ভেঙে গেছে। কিন্তু আয়লার মতো এমন বিধ্বংসী ঝড়ের কবলে সুন্দরবনের মানুষ আগে পড়েননি। দিনে না হয়ে ঝড় যদি আসত রাতে তবে প্রাণহানি হত আরো কয়েকগুণ বেশি। ঝড়ের দিনের ওই অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটি পরিবার থেকে তুলে আনলে সেসব হবে এক-একটা রোমহর্ষক মর্মান্তিক কাহিনী।

আয়লার ঝড় (২৫ মে ২০০৯) কেটে যাবার এক সপ্তাহ পরে মনে হয়েছিল ঝড়ের ঝাপটা তো গেল, এর পরিণতি আমরা কি ঠিক পরিমাপ করে উঠতে পারব? আমরা কী করেছি? দুর্গত মানুষদের মাঝে কাজ করতে নেমেছি। আবার ভরা কোটালে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসার আতঙ্কে দিন কাটিয়েছি। দুর্যোগের পরে পরেই আমরা যে চেহারাটা দেখি, তা দিয়ে কি পরিণামের সবটা বোঝা যায়? এমনিতেই (য়(তি নিরূপণের একটা আমলাতান্ত্রিক, আবার একটা রাজনৈতিক ধারাও আছে।

প্রশাসনিক পন্থার একটা পন্থা হল, আকাশপথে পরিদর্শন। আর দুর্গত এলাকার মধ্যে যতটা দূর মোটামুটি সুগম, সেই পর্যন্ত পৌঁছেই একটা আন্দাজ করে নেওয়া। প্রশাসনের চোখ এভাবেই (য়(তি নিরূপণ করে, অর্থ মঞ্জুর করে, ত্রাণ-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। আবার অনুদান আসে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন থেকেও। এই যে কাজটা হয়, সেই কাজ এক-একটা মহল করে এক-একটা টানে। কিসের টান? কারো কাছে এটা দায়, কারো রাজনৈতিক মুনাফা, কারো কাছে আবেগ, কারো কাছে বিবেক। বিপন্ন মুহূর্তে কখনও কোথাও এই দায়, মুনাফা, আবেগ, বিবেকের মধ্যে সমন্বয় হয়েছে—এমনটা দেখা যায়নি। কারণ এই দুর্যোগ দুর্গতিকে ঘিরে যে প্রতিত্রি(য়া নানা মহলে তৈরি হয়,এর মধ্যে আছে পরস্পরবিরোধিতা। সুতরাং সমন্বয়ের ভাবনাটাই আকাশ কুসুম কল্পনা।

এই বিপন্নতা

মানুষ বিপন্ন হলে মানুষই তার পরিত্রাণ। সেই পরিত্রাতাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যদি থাকে, তবে বিপন্ন মানুষদের দুর্গতি দূর হওয়া কঠিন। সময় বয়ে যাওয়ার

সঙ্গে দুর্গতিতে একটা প্রলেপ পড়ে। কিন্তু (তিগ্রস্তের গভীরে থেকে যায় (ত। এই (তটা টাকার অঙ্কে মাপা যায় না। এমন কী এককালীন অর্থ সাহায্যেও তা দূর হয় না। থেকে যায়, মানুষও সয়ে যায়। সইতে সইতে পাথর। এ যেন আবহমান কাতরের আর পাথরের জীবন। তবুও এরই মধ্যে জীবনের হাতছানিটা থাকেই।

বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে ঘর করা মানুষের মাঝে তাদের যে শিশুরা প্রথম দেখে এমন বিপর্যয়ের দাপট, চোখের সামনে সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে ভেসে যেতে দেখে, ঝড়ের মুখে তার খাবারের থালাটাই ছিটকে যায় হাত থেকে (আয়লা এসেছিল দুপুর বেলায়)— সেই শিশুর অসহায়তা, আতঙ্ক কি টাকার অঙ্কে মাপা সম্ভব!

দেখছিলাম টেলিভিশন চ্যানেলের ছবিতে রাজ্যপাল গোপালকৃষ(গান্ধী দুর্গত এলাকায় শিশুদের কাছেই যাচ্ছিলেন বারবার। হাঁটু ভেঙে নীচু হয়ে তাদের কথা শুনতে চাইছিলেন। বি(াসও পুরে দিতে চাইছিলেন তাদের মনে। ভরসা জাগাচ্ছিলেন হয়ত। এই সুযোগে বিপন্ন মুহূর্তেও বয়স্কদের বারবার বলছিলেন(ছেলেমেয়েদের অবশ্যই পড়াশোনা করানোর কথা। মেয়েদের যেন অল্পবয়সে বিয়ে দেবার কথা কেউ না ভাবেন। চরম দুর্গতি আর অনটনের মধ্যেও জীবনকে জীবনের মতো বাঁধার কথাই বলছিলেন বারবার। আর সর্বস্ব হারানো মানুষদের কাহিনী তো শুনছিলেনই।

এরই মধ্যে একটা দৃশ্যে রাজ্যপাল বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন মনে হল। ওই ঘূর্ণিঝড়ের দিন থেকে একবস্ত্রে রয়েছেন, এমন মানুষের মাঝে সুসজ্জিতা হয়ে রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে একদল মহিলা যখন তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। এর সঙ্গেই অনেকে তুলনা করতে চেয়েছেন, ঠিক আগের দিন ওই দুর্গত এলাকাতেই একজন জনপ্রতিনিধিকে অ(চিকরভাবে হেনস্থা করার দৃশ্যটি। (োভ-বি(োভ আর অসৌজন্য বা কু(চি এক জিনিস নয়। একদিকে পুষ্পবৃষ্টি আর অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিকে কাদা ছেটানোর দৃশ্যের মধ্যে মানুষের পাশে মানুষ হিসেবে দাঁড়ানোর ছবিটা ফুটে ওঠে না। রাজ্যপাল পুষ্পবৃষ্টি থেকে তাই সুসজ্জিতাদের বিরত থাকার কথা বলেছিলেন।

এই রকম বিপন্ন মুহূর্তে বারবার অভিজ্ঞতা থেকে শি(া নেবার কথা ওঠে। আমরা এমন একটা প্রতিত্রি(য়া তো শুনতেই পেলাম একমাসের মধ্যেই আবার একটা যদি ঝড় হয়, তবে কলকাতা শহরে পড়ে যাওয়া গাছ দ্রুত সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। কারণ এবারের আয়লার অভিজ্ঞতা তখন কাজে লাগানো যাবে। বড় বড় গাছ কেটে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার জন্য ইতিমধ্যে বড় বড় করাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। হয়ত বলতে চাওয়া হয়েছে, 'হায়রে বরাত, কোথায় করাত'—এমন কথা আর একটা ঝড় হলে শুনতে হবে না। কথাটি বলেছিলেন শহরেরই মহানাগরিক। করাত-কুড়ুলের কথা বাদ দিয়েও যদি এই প্র(্ন ওঠে ঝড়ের দাপট ছিল অবশ্যই, কিন্তু এত গাছ কেন পড়ল? গাছ কোথায়, কতটা দূরত্বে লাগানো হবে, তার শিকড় বিস্তারের জন্য কতটা পরিসর দেওয়া হচ্ছে, গাছের ডাল ছেঁটে দেওয়ার সময় কী পদ্ধতি মানা হচ্ছে— প্রতিটি গাছের সঠিক পরিচর্যা হচ্ছে কি না, শুধু ফুটপাথ খুঁড়ে চারা লাগানোকেই সবুজায়ন বলে কিনা—নগরের রূপকারদের তা কি আদৌ ভাবায়? কতবার ঝড় হলে তবে কাজ করার মতো অভিজ্ঞ হওয়া যায়, এ প্র(্ন তো উঠতেই পারে। সেইজন্যই মনে হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দৃশ্যমান (তি তো চোখের সামনেই। কিন্তু যে বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রকৃত শি(া নেওয়া হয় না, সে বিপর্যয়ের (তি টাকার অঙ্কে মাপা সম্ভব হলেও তার গভীরতর (তি ও (ত পরিমাপ করা শক্ত(।

বাঁধের জীবন জীবনের বাঁধ

আমাদের একটা বাঁধা বুলি আছে। কোনো একটা বিপর্যয় দুর্যোগের কয়েকটা দিন পরই আমরা বলতে শু(করি মানুষের জীবন আবার ছন্দে ফিরছে। বিপর্যয়ের আগে তাদের জীবনে সত্যিই কতটা ছন্দ ছিল, তার কোনো খবর আমরা রাখিনি। 'ছন্দে ফেরা' বলতে জীবন যাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছে বলে আমরা যে দাবি করছি, এই 'স্বাভাবিক হওয়ার' সংজ্ঞাটা কী?

আয়লা যখন এল তখনই আবহাওয়া দপ্তর ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এর সঙ্গেই বর্ষা এসে গেল। বলা হল, এবারে একটু আগেভাগেই এল বর্ষা। কিন্তু আবহাওয়া গতিপ্রকৃতি দেখে কি বর্ষার পুরোপুরি মেজাজ পাওয়া যাচ্ছিল? বরং দুঃসহ গরমে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। বর্ষা বলতে প্রতিদিনই বৃষ্টি হবে এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু আকাশে ঘনঘন জলভরা মেঘের আনাগোনা থাকবে এটা ধরেই নেওয়া যায়। কিন্তু কার্যত তা দেখা যায়নি। অথচ আয়লার সঙ্গেই এ রাজ্যে মৌসুমী বায়ু ঢুকেছিল। আবার অন্যদিকে তাপমাত্রা দিয়ে গরমের তীব্রতা মাপা কঠিন। একদিকে দ(িণবঙ্গে যখন গরমের জ্বালায় মানুষের চামড়া পুড়ছিল, তখন উত্তরবঙ্গের কোথাও ছিল বৃষ্টি, তবে তা সামান্য। আবহাওয়া দপ্তর বর্ষার ঘোষণা করার পরেও জুন মাসে উত্তর দিনাজপুরে গরমে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। অনেক জেলাতেই তেমন বৃষ্টির দেখা নেই, অথচ সেই জেলাতেই (িকের বৃষ্টিতে বজ্রাঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

আবহাওয়ার এই আচরণ বি(্ব-উষ(ায়নেরই ফসল, সে বিষয়ে এখন আর কোনো মহলেই সংশয় নেই। আয়লার তাণ্ডবের পর সুন্দরবনের মানুষের জীবনে বৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি দুটোই সমস্যা তৈরি করছে। বৃষ্টি হলে যেসব জমিতে নোনাজল ঢুকেছে সেখানকার নোনাভাব কিছুটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আর ছেঁড়াখোঁড়া পলিথিন শিটের নীচে কাটানো জীবন যে বৃষ্টিতে আরো দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে(আবার কোটাল বা ষাঁড়াষাঁড়ি বানে কোথাও নতুন করে নোনাজল ঢুকেছে। আবার বৃষ্টি না হলে চাষের জমিতে নোনাজলের প্রভাব কমবে না। বরং মাটির আরো গভীরে নোনা বসে যাবে।

জেনেভার গোবাল হিউ স্যানিটোরিয়াম ফোরাম সমী(া করে জানিয়েছে, জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য প্রতি বছর বি(্বে অতিরিক্ত(তিন ল(পনের হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এর মধ্যে অনাহার, ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবই আছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ এই মৃত্যু হারটা দাঁড়াবে পাঁচ ল(। কিন্তু মৃত্যু দিয়েই তো সব (তির পরিমাপ হয় না। বরং ত্র(মাগত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় যত মানুষের কোনো না কোনো ভাবে (তি হচ্ছে তার সংখ্যা বত্রিশ কোটি পঞ্চাশ ল(। অর্থাৎ বি(্বের জনসংখ্যার দশ শতাংশ মানুষ (তিগ্রস্ত হচ্ছেন। আর্থিক (তি বারো হাজার পাঁচশো কোটি ডলার। আর কুড়ি বছর পর এই অঙ্কটা চৌত্রিশ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ধনী দেশগুলি বিভিন্ন গরিব দেশকে বছরে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে এই (তির অঙ্ক তার তিন গুণ। অথচ ধনী দেশগুলিই পরিবেশ দূষণের এবং উষ(ায়নের বড় উৎস। বি(্বখ্যাত পরিবেশবিদ র‍্যাচেল কার্সন তাঁর 'মৌন বসন্ত' (সাইলেন্ট স্প্রিং) গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশ ধ্বংস করছে, এই অর্থনীতিটা অতি-উৎপাদন প্রবণ।' তিনি বলছেন, আধুনিক পৃথিবী চায় গতি, দ্রুততা, অতি সহজে যে কোনো আকাঙ্(িত বস্তুকে মুঠোয় পুরতে। এই পৃথিবী এখন প্রকাণ্ড, বিপুল আর বিশালতার ভক্ত(। আর সেটাই পরিবেশের জগতে ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

ধনী দেশগুলি বেশি পরিমাণে দূষণ ঘটালেও তার বোঝা বইতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলির গরিব মানুষদেরই। মানুষের জীবনযাপনের ভঙ্গি বা জীবনশৈলী কী হবে, তাও নির্দেশ করছে বা চাপিয়ে দিচ্ছে ধনী দেশগুলিই। ওই সব দেশেই জনপ্রিয় করে তোলা প-াস্টিক, পলিব্যাগের মতো সামগ্রী ছড়িয়ে গেছে উন্নয়নশীল ও গরিব দেশেও। দুর্গত সুন্দরবনেও অনেক ত্রাণসামগ্রী যাচ্ছে প-াস্টিক, পলিথিনের বস্তায়। তারপর ছড়িয়ে থাকছে নদীর দু-পাড়ে। ওরই ভেতরে হয়ত আছে আরো দুর্যোগের পূর্বাভাস।

কোথায় ত্রাণ, পরিত্রাণ

আয়লার পরে যে চারমাস পেরিয়ে এলাম, তার মাঝে চলে গেল আরো একটা সুন্দরবন দিবস। দিবসটা ছিল প্রথামাফিক। কিন্তু তাৎপর্যটা ছিল এবারে অবশ্যই আলাদা। এই মুহূর্তে জ(রি প্র(হল, সব কিছু হারানোর পর কেমন আছেন ওই সব এলাকার মানুষেরা? তাঁদের কি এখনো কোনো ত্রাণসামগ্রীর প্রয়োজন নেই? বাঁধের কাজ কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? দুর্গতরা কি নতুন ঘরবাড়ি করে নিজেদের ভিটেতে ফিরতে পেরেছেন? কেউ তথাকথিত ত্রাণ শিবিরে না থাকার অর্থই কি আর খয়রাতি সাহায্যের প্রয়োজন নেই? সকলেই কি তাঁদের কাজের জগতে ফিরতে পেরেছেন? সবাই কি কাজ পাচ্ছেন? কিছুটা কাজ পেলেও তার মজুরি কি পুরোপুরি পাচ্ছেন? দুর্গত সব পরিবারই কি গ্রামে আছেন? কোনো পরিবারই কি জীবিকার বা আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায় নি? দু-মুঠো খাবারের জন্য অন্নের সন্ধান করতে গিয়ে তারা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে না তো? — এই সব প্র(নিয়ে এখনো দুর্গত এলাকায় দাঁড়ালে মন খুশি করার মতো কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না।

সুন্দরবনে তিন হাজার চারশো কিলোমিটার নদীবাঁধ আছে। এর সবটাই ভেঙে চুরে ভেসে গেছে, তা নয়। এক হাজার কিলোমিটার বাঁধের চরম (তি হয়েছে। অনেক বাঁধ নিশ্চিহ্(হয়ে গেছে। মাটি ফেলে এই বাঁধ মেরামতি এবং নতুন করে বাঁধ দেবার কাজ শু(হয়েছে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু আয়লার পরেই বাঁধের কাজ শু(হয়ে গেল বলে আমরা যে ধ্বনি তুলেছিলাম, প্রকৃতই বাঁধের কাজ আমরা কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছি? মনে রাখা দরকার, যে বাঁধগুলি পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি বা ভেসে যায়নি, সেইসব নদী সন্নিহিত বা সমুদ্র সন্নিহিত বাঁধ অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে সেগুলির দিকেও নজর দেওয়া দরকার। নইলে এই বাঁধগুলি আরো (তিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কোনো আয়লার প্রয়োজন হবে না।

আবহাওয়া এখন আর এতদিনের বাঁধা ঋতুর পথ ধরে চলে না। তাই মাঝে মাঝে বৃষ্টি আর বৃষ্টিহীনতার মাঝে বাঁধের কাজ হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে সেই বাঁধের মাটি কাটা হবে, বাঁধ থেকে কত দূরে হবে সেই মাটি কাটার জায়গা, সেই মাটি কাটার জায়গা অন্য কী কাজে লাগানো হবে — তার দাবিটা এখনো স্পষ্ট নয়। বাঁধের খুব কাছ থেকেই মাটি কাটা হলে বাঁধটাই সহজে ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঝড় না হয়ে যদি বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়, তখন সাময়িকভাবে বহু মানুষ বাঁধের ওপর আশ্রয় নেন। অতএব বাঁধটাও মজবুত হওয়া দরকার। শু(র দিকে সেচদপ্তর অনেক জায়গায় বাঁধ দেবার কাজ করিয়েছে। এই কাজ হয়েছে ঠিকাদারের মাধ্যমে। আগাম কোনো টাকা বা কাজ শেষ হলেই সব(ত্রে ঠিকাদাররা কাজ না করলে তাদের কালো তালিকাভুক্ত(করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। তবে এমন ঘটনাও আছে, অনেক (ত্রে ঠিকাদার সেচদপ্তর বা সরকারের ঘর থেকে টাকা না পেলেও প্রাথমিকভাবে মানুষের দুর্গতির কথা ভেবে নিজের পকেট থেকেই মজুরি দিয়েছেন। কিন্তু এই চিত্র সর্বত্র নয়।

আবার একথাও মনে রাখা দরকার, হাতে কিছু টাকা পেলেই সুস্থভাবে তা বাঁচার প(যথেষ্ট নয়। চার মাস হয়ে গেল, মাথার ওপর আজও বেশিরভাগ মানুষের স্থায়ী ছাউনি হয়নি। কোথাও ভেসে যাওয়া চালার অংশে প-াস্টিকের ঢাকনা দিয়ে কোনো রকমে প্রায় বেআব্রু দিনযাপন। সরকার থেকে গণবণ্টনের মাধ্যমে যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের কথা তার যতটুকু গিয়ে শেষপর্যন্ত প্রাপকের হাতে পৌঁছয়, তা তাদের জন্য প্রকৃত বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম। সরকারিভাবে পরিসংখ্যানের উদ্যোগ না নেওয়া হলেও অনেক অসহায় পরিবার ইতিমধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রকৃত অর্থে পুনর্গঠনের কাজ শু(ই হয়নি বলা যায়। পুনর্গঠন বলতে শুধু নতুন করে বাড়িঘর নির্মাণ নয়। কোনো ব্যাপারে নীতিটাই এখনো স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ নয়।

প্রথমত সুন্দরবনে পরিবার ভিত্তিক (য়(তি নিরূপণের কাজে কারচুপির খবর আসছে। সং(-ষ্ট এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে চারজনের কমিটি গড়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই অভিযোগ স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, মানুষের এখন যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাতে গণবণ্টন ব্যবস্থার যে দুর্বলতা, এমন কি বিদ্যুৎহীন, যোগাযোগের সঙ্কটে জর্জরিত জীবনে (তার ওপর নোনা জলের জমিতে কোনো ফসল হবে না) অন্তত আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মানুষকে খাইয়ে রাখতে হবেই। নইলে লালগড়ের মতো বিস্ফোরণ ঘটবেই এমন কোনো কথা নেই। (তিটা ভেতরে ভেতরে হতেই থাকবে। তৃতীয়ত পানীয় জল বড় সমস্যা। দেড় হাজার ফুটের কমে ভালো জল পাওয়া যায় না। একটি কল বসাতে কম করে একল(টাকা খরচ। এ (ত্রেও নির্দিষ্ট কর্মসূচি দ্রুত রূপায়ণ দরকার। চতুর্থত, কংত্রি(টের বাঁধ হবে না, এটা যেমন নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে, তেমনি (তিগ্রস্ত বাড়ির পুনর্নির্মাণ কোন নীতিতে হবে। আয়লার মতো তাণ্ডবের হাত থেকে র(া পাবার মতো উপযুক্ত(জমি বা নতুন বাড়ির ভিত কতটা উঁচু করা দরকার তার জন্য কোথা থেকে মিলবে মাটি তার স্পষ্ট নীতি আমরা জানি না। নদী থেকে বাঁধ দূরে দেবার জন্য গ্রামের মানুষের কাছ থেকে জমি কিনে নেবে বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তা বাস্তবে কতটা সম্ভব? তাহলে ইতিমধ্যেই যে বাঁধ দেওয়া হল তা কোন নীতিতে রূপায়িত হয়েছে? পঞ্চমত, নোনা জমিতে ফসল ফলাবার জন্য অনেকরকম প্রজাতির ধানের উদ্ভাবনের কথাই আমরা শুনতে পাই। কিন্তু আজ নোনাজল প-াবিত এলাকায় চাষের জন্য সেই বিকল্প বীজধানের জোগান কোথায়? তাছাড়া খরিফের ফসল যখন হচ্ছেই না, তখন রবিখন্দে কীভাবে উঠে দাঁড়ানো যায়, তার কোনো পরিকল্পনা যে এখনই নেওয়া দরকার। প্রশাসনিক স্তরে তেমন তৎপরতা জোরদার কী?

সুন্দরবনের জনসংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পরিবেশের স্বার্থে সুন্দরবনের মানুষের জীবন ও জীববৈচিত্র্যের স্বার্থে এই জনসংখ্যা একটা জায়গায় বাঁধতেই হবে। এটা যে কত প্রয়োজন তার শি(া দেবার জন্য বাঘ জঙ্গ ল ছেড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ে। এসব কথা ভেবেই সঠিক সমন্বয় সাধিত নীতি ও তার যথার্থ রূপায়ণ দরকার। আয়লা-দুর্গতদের জন্য পানীয় জলের প-াস্টিক পাউচ আকাশ থেকে ফেলে দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। বিকল্প নীতি প্রয়োজন। আয়লা-দুর্গত ঝড়বিধ্বস্ত সুন্দরবনের জন্য এমন অনেক প্র(জমে আছে। এইসব প্র(ের সদুত্তর ও সমাধান যদি আমাদের কাছে না থাকে, তাহলে সঙ্কট বাড়বে বই কমবে না।

জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ সরকার, আইন ও মানব অধিকার

নিরঞ্জন হালদার

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা—তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশে কৃষকেরা কৃষিজমি ও আদিবাসীরা জমি ও বন থেকে উৎখাত হচ্ছে। এই উৎখাত বিশেষ এক ধরনের উন্নয়ন-পদ্ধতির জন্য এবং তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-নিরপে(। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো কম্যুনিস্ট চীনেও একই ধরনের ব্যাপার ঘটছে। চীনে জমির মালিক সরকার হলেও কৃষকেরা জমিতে চাষবাসের অধিকার বজায় রাখার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ করছে, সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষক ও আদিবাসীরা জমি ও বনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে একইভাবে সচেষ্ট। সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে দেশে দেশে আন্দোলন এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব অধিকার কমিশন জমিহারাদের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। প্রমাণ 'ফোর্সড এভিকশান অ্যাণ্ড হিউম্যান রাইটস' পুস্তিকা। এই পুস্তিকা থেকে জানা যায়, বর্তমানে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে কমপ(এক কোটি লোক জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। এখন আর কেউ সরকারি আদেশে জমি ও বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছে না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, ওড়িশার মতো অন্যত্রও জীবন ও জীবিকার অধিকার বজায় রাখার জন্য সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে জবরদস্তির সাহায্যে জমি কেড়ে নেওয়া বন্ধ করার উদ্দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব অধিকার কমিশন স্পেশাল র‍্যাপোর্ট্যুর নিয়োগ করেছে, যাঁর কাজ হবে সরেজমিনে তদন্ত করে মানব অধিকার কমিশনের বিভিন্ন কমিটিকে জানানো।

বেশির ভাগ (ে ত্রে জমি থেকে উৎখাত করার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আদেশই যথেষ্ট। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতে সরকার 'জনস্বার্থের' দোহাই দিয়ে আইনের সাহায্যে জমি অধিগ্রহণ করে থাকে। এই আইনে জমির মালিকদের (তিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বনাঞ্চলের জমিতে বসবাস ও চাষবাস করেন, এমন ব্যক্তি(দের নাম সরকারি নথিতে থাকলে তাঁরাও (তিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। এই আইন তৈরির একটি ইতিহাস আছে। ১৮৮০-র দশকে গোটা উত্তরভারতে ভয়াবহ দুর্ভি(ে র পরিপ্রে(িতে লোকের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার দুটি কর্মসূচি নেয়—রেলপথ নির্মাণ ও সেচ-খাল কাটা। জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে সরকার জেমিন কমিশন গঠন করে। ১৮৮৯ সালে পেশ করা দেমিন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন পাস ও চালু করে। এই আইনের সাহায্যে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ করে কত খাল কেটেছিল, তার বিবরণ মিলবে লেডি হোপ রচিত 'জেনারেল স্যার আর্থার কটন' বইটিতে। ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) বইটি ১৯৬৪ সালে পুনর্মুদ্রণ করে। জন কেনেথ গ্যালব্রেথ তাঁর 'দ্য নেচার অফম্যাস পভার্টি' (১৯৭৯) বইতে উল্লেখ করেছেন যে, দুর্ভি(ে র ত্রাণকাজ হিসাবে কাটা দীর্ঘ সেচব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। এই আইনের সাহায্যে জমি অধিগ্রহণ করে অল্প খরচে ভারতীয় রেলপথ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। ('much Indian railboard building was a famine relief measure.' গ্যালব্রেথ, ঐ পৃ ৫৭) যাই হোক, ১৯৫০ সালের আগে এই আইনের প্রয়োগ তত ব্যাপক ছিল না। রেল লাইন সম্প্রসারণ, সড়ক নির্মাণ, বন্দর, বিমানবন্দর,সরকারি অফিস, হাসপাতাল, সরকারি শিল্পসংস্থার জন্য সরকার এই আইনে জমি অধিগ্রহণ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক সেনানিবাস, সামরিক বিমানবন্দর প্রভৃতির জন্য জমির প্রয়োজন মেটাতে এই আইন প্রয়োগ করেছিল। তখন বেসরকারি শিল্পসংস্থাগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করতে হত। হাওড়ার দাশনগর আলামোহন দাশের ব্যক্তি(গত উদ্যোগের পরিণতি, সরকার জমি অধিগ্রহণ করে তাঁকে সাহায্য করেন নি।

১৯৫০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প, শিল্প ও শিল্পনগরী, উপনগরী, বন্দর, বিমানবন্দর, বি(বিদ্যালয়, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ, মিটারগেজ রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তর, হাসপাতাল, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই আইনটি সংশোধন করেছে। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় আইন সংশোধন করে ৩১এ ধারা যোগ করা হয়েছে, জমির উর্ধ্বসীমা আইনের কম জমি যদি মালিক চাষবাস করে, তা হলে সেই জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। সেই জমিতে যদি বাড়ি, কুঁড়েঘর থাকে, তাহলে বাজার দর দিয়েই ঐ জমি কিনতে হবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বহুবার আইনটি সংশোধন করেছে। যেমন, মহারাষ্ট্রে অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তির পর দু বছরের মধ্যে জমির দাম না দিলে বিজ্ঞপ্তি বাতিল হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গেও এই আইন বহুবার সংশোধিত। হাওড়া, কলকাতা প্রভৃতি শহর এলাকায় শহর উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের (মতা লাভ এবং কৃষিজমি অধিগ্রহণের (ে ত্রে বর্গাদারদের (তিপূরণ দেওয়ার শর্ত যোগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনে জমি অধিগ্রহণের জন্য জনস্বার্থের সংজ্ঞাও সম্প্রসারণ করেছে। সরকার জনস্বার্থের নামে জমি অধিগ্রহণ করে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দিতে পারে। অতীতে বিড়লাদের হিন্দুস্তান মোটর্সের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে 'লিজ' দিয়েছিল, রাজ্য সরকার সেই জমির অব্যবহৃত অংশ বহুবছর পরে ২০০৮ সালে রিয়েল এস্টেটের বাড়ি করার জন্য বিক্রি(করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ২০০৬ সালে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে টাটা মোটরসকে এক গোপন শর্তে লিজ দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিমের কোম্পানির জন্য নন্দীগ্রামে, বনগাঁ থেকে দ(ি ণ ২৪ পরগনা হয়ে হলদিয়া যাওয়ার জন্য চার লেনের সড়ক, স্বাস্থ্যনগরী, উলুবেড়িয়ায় মোটর বাইক তৈরির কারখানা স্থাপনের জমি গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিল বা জমি অধিগ্রহণ করেছে। ভারত সরকারের তফসিলি জাতি ও উপজাতি কমিশনার ডঃ বি. ডি. শর্মা কমিশনের ২৯তম রিপোর্টে (১৯৮৭-১৯৮৯) প্র(তুলেছিলেন, জনস্বার্থ বলতে কী বোঝায়? কারা ঠিক করে প্রকল্পটি জনস্বার্থ কিনা, স্থানীয় মানুষের মতামত নিয়ে প্রকল্পটি জনস্বার্থের কিনা বিবেচনা করা হয় কিনা। কমিশনার ডঃ শর্মা তাঁর রিপোর্টে এ প্র(ের জবাব দিয়েছেন প্রকল্পটি জনস্বার্থ কিনা তা ঠিক করেন রাজনৈতিক নেতারা, কখনও অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা। এখন আবার ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে পরিকাঠামোতে জনস্বার্থ কার্য করার শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে বিদেশি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য। সেজন্য, চার-ছয়-আট লেনের সড়ক, সেতু, বিমান বন্দর, উপনগরী, রিয়েল এস্টেট, পর্যটনকেন্দ্র, স্বাস্থ্যনগরী পরিকাঠামো শিল্প হিসাবে গণ্য। তাই এখন শিল্পোন্নয়ন বলতে আর কলকারখানা বোঝায় না। সড়ক, সেতু, উপনগরী, স্বাস্থ্যনগরী, শিল্পনগরী, হাসপাতালও বোঝায় এবং

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নির্ধারণে এসবের অবদান সরকারের কাছে খুবই গু(ত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে ২০০৫ সালে চালু করা 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' বা 'সেজ' প্রকল্প সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। দেশি ও বিদেশি শিল্পসংস্থা কোনো কারখানা বা অন্য ধরনের শিল্প স্থাপন করতে চাইলেই কেন্দ্রীয় সরকার সেটিকে 'সেজ' এলাকার শিল্প হিসাবে ঘোষণা করছে। সেই শিল্প-এলাকায় ভারত সরকারের শ্রম-আইন কার্যকর হবে না, নানা ধরনের কর দেওয়া থেকেও রেহাই পাবে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দাল কোম্পানির ইস্পাত কারখানার বি(দ্ধে, ওড়িশায় পাস্কো কোম্পানির বি(দ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ও ওড়িশায় জমি অধিগ্রহণের প্রতিত্রি(য়া হিসাবে শাসক দলের প্রার্থীদের পরাজয়ের ঘটনা আমরা জানি। মহারাষ্ট্রে রায়গড় জেলায় 'সেজ' স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসি মন্ত্রী এর-আর আন্তুলে। সেজ-বিরোধী আন্দোলনের জন্য লোকসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন এবং বিজ্ঞপ্তির দু বছরের মধ্যে জমির দাম না মিটিয়ে দেওয়ায় বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে কৃষকরা তাঁদের জমির অধিকারের নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছেন। বিশেষ এলাকায় রপ্তানি-পণ্য উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সব 'এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন' স্থাপন করেছিল, সেগুলিকে সেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় চারশোর মতো 'সেজ' প্রকল্প ভারত সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য সরকার কৃষিজমি ও বনাঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ করছে এবং সবই জনস্বার্থ ও শিল্পোন্নয়নের নামে। কৃষক ও আদিবাসীরা জমি অধিগ্রহণে আপত্তি জানালেই তাঁদের বলা হচ্ছে উন্নয়ন-বিরোধী। শি(িত মধ্যবিত্তরা এই প্রচার গিলছেন। ডঃ শর্মা কমিশনের ২৯ তম রিপোর্টে এই ভাবনার মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন সংগঠিত শিল্প দেশের মানুষের মনে গু(ত্ব পেয়েছে দুটি কারণে। উন্নয়নের বর্তমান ধারা অনুসারে সংগঠিত আধুনিক শিল্পের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং ঐ সব শিল্পসংস্থার মালিকেরা দেশের উন্নতির জন্য কাজ করছেন, এমন একটি ধারণা লোকের মনে চেপে বসেছে। দুই, সরকার, সংবিধান, আইন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত শিল্পের অংশ হয়ে গিয়েছে। এ বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় শিল্পপতিদের পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং বাজেট পাসের পর আবার তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড়লোক করদাতাদের কর থেকে নানারকম রেহাই দিয়েছেন। অথচ আমজনতার উপর নানারকম বোঝা চাপিয়েছেন।

ডঃ বি. ডি শর্মা তাঁর রিপোর্টে আরও বলেছেন, সংগঠিত শিল্পকে দেশের উন্নতির প্রধান ভূমিকা হিসাবে গণ্য করায় লোকের মনে অসংগঠিত শিল্পসংস্থা, কৃষি, বনসম্পদের ভূমিকা একেবারেই অবহেলিত। কিন্তু দেশের সংগঠিত শিল্পে শতকরা কতজন শ্রমিক কাজ করে? রবীন্দ্র বর্মা কমিটির রিপোর্ট অনুসারে মাত্র ৭ শতাংশ এই ৭ শতাংশের জন্যই যত শ্রমিক আইন, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনশন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি। বাদবাকি ৯৩ শতাংশের মধ্যে মাঝারি, (ুদ্র ও কুটিরশিল্পের শ্রমিক, কৃষি-কর্মে নির্ভর, বনের জমি ও বনসম্পদের কর্মী, দোকান-কর্মচারী, ঠিকাদার নিযুক্ত(প্রহরী, গাড়ির চালক, অন্যান্য পরিষেবার কর্মীরাও আছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা শুনিয়ে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের 'সেজ'-এ নানা ধরনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের গু(ত্ব কতটা? অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিত ভাদুড়ী গত ২৬ আগস্ট দিল্লিতে ডি. এম বোরকর স্মারক বক্তৃ(তায় বলেছেন, 'ভারতের কর্পোরেট সেক্টরে মোট শ্রমিকের ৩ থেকে ৪ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে।' যাদের কাছে ভারত সরকার, এমন কিপশ্চিমবঙ্গ সরকারও সবসময়ে নতজানু, ভারতীয় অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। ডঃ ভাদুড়ী আরও বলেছেন, 'এরা ঠিকাদারি প্রথার মাধ্যমে কাজ করাচ্ছে। এই ঠিকাদারেরা কোনো শ্রমিক-আইন মানে না এবং বেশি সময় খাটিয়ে কম বেতন দেয়।' (দ্য স্টেটসম্যান, ২৭ আগস্ট, ২০০৯)

এখন আপত্তি এত বেশি কেন?

১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে আপত্তি আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। প্রথমত কৃষিজমির পরিমাণ ত্র(মেই হ্রাস পাচ্ছে। উৎখাত হওয়া ব্যক্তি(রা অন্যত্র বসবাস ও কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আগে সরকার ও সরকারি সংস্থার জন্য কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করা হত, এখন অসংখ্য ব্যাপারে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এবং সে সবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ প্রধানত সড়ক-পরিবহন নির্ভর। কিন্তু সে দেশে বেশিরভাগ সড়ক দুই লেনের। ভারতে চার-ছয়-আট লেনের সড়ক প্রধানত টোল আদায়ের জন্য, এই সড়কের সঙ্গে দুই পাশের গ্রামগুলির যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাবে গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও খারাপ হয়। এই প্রশস্ত সড়কগুলি দ্রুতগামী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশি। এই প্রশস্ত সড়কের জন্য জমি দিয়ে কৃষকেরা নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে যাবে কেন? উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বালিয়া থেকে দিল্লির অদূরে নয়ডা পর্যন্ত আট লেনের সড়ক নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চাষীদের লাভ হবে না, এমন প্রকল্পের জন্য তারা জমি দেবে কেন? প্রস্তাবিত সড়ক বরাবর এলাকার লোকেরা ভোট দিয়ে মায়াবতীর দলকে হারিয়ে দিয়েছে। মেচেদা-হলদিয়া সড়ক চার লেনের করার প্রস্তাব কৃষকেরা বাতিল করেছে। তমলুকের সিপিএম প্রার্থী ল(ণ শেঠের বি(দ্ধে ভোট দিয়ে। মিটার গেজ রেলকে ব্রডগেজে রূপান্তরের জন্যও কৃষিজমি দরকার। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দ(িণ কোরিয়ার মতো ধনী দেশগুলিতে যদি মিটার গেজ ট্রেন চালু থাকতে পারে, ভারতেও দুই ধরনের রেলপথ থাকতে আপত্তি কেন? মিটার গেজের ট্রেনের রেল-লাইন সমেত সব যন্ত্রপাতি বিত্রি(র মাধ্যমে টাকা রোজগারের যে সুযোগ রেলমন্ত্রী জাফর শরিফের আমলে শু(হয়েছিল, সেটা এখনও বজায় আছে। নতুন বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের পিছনেও আছে টাকা রোজগারের ধান্দা। হায়দ্রাবাদে বেগমপেট বেমান বন্দর ও বাঙ্গালোর শহরের বিমানবন্দর থাকতে দুটি নতুন বিমান বন্দর করার দরকারই ছিল না। কয়েক হাজার কৃষকের জমি বেঁচে যেত। তৃতীয়ত, ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু জ(রি অবস্থার প্রয়োজন দেখিয়ে জমি অধিগ্রহণের জন্য আইনের ১৭ নং ধারা এবং কম (তিপূরণ দেওয়ার জন্য আইনের ১১নং ধারা বদলানো হয় নি। জেলার কালেক্টর ইচ্ছা মতো (তিপূরণের পরিমাণ স্থির করতে পারেন, এটাই আইন। অধিগ্রহণের সময় যে দাম সরকার দেবে, তার বি(দ্ধে আদালতে গিয়েও কোনো লাভ হয় না। কারণ আইন তার প(ে নয়। সম্প্রতি বেদিক গ্রামে ফুটবল খেলার সময়ে একজনের মৃত্যুর পর রাজারহাট ও বেদিক গ্রামে জমি অধিগ্রহণের কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। রাজারহাটে আইনের ১৭ ধারা অনুসারে জমি অধিগ্রহণ ছিল একেবারেই বেআইনি। গ্রামগুলিকে 'উপনগরী' ঘোষণা করলে জমির ঊর্ধ্বসীমার আইন এড়ানো যায়, বেদিক গ্রামের জমি-দখলের কেলেঙ্কারিতে তা জানা গেল। ১৯৬৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করে আইনে ৩১ (১) ধারা যোগ করে কম কৃষিজমির মালিকদের উৎখাতের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৭ ধারা প্রয়োগ করে সরকার ৩১ (১) ধারাকে চাপা দিয়েছে।

আইন সংবিধান বিরোধী কেন?

ডঃ বি. ডি. শর্মা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরেজ শাসনে ভারতীয় নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। তাই ১৮৯৪ সালের জমির মালিকের অধিকারের কথা ভাবাই হয় নি। টাকা দিয়েই জমির মালিকানা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ১৯৭৫ সালে জ(রি অবস্থা জারি করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। জনতা পার্টির সরকারের আমলে আমরা সেই অধিকার আবার ফিরে পাই। যাই হোক, রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সমস্ত মানব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র এবং গু(ত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার। জীবনের অধিকারের অর্থ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকা। মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার দুটি প্রাথমিক শর্ত হল ব্যক্তি(স্বাধীনতা এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।' রিপোর্টে আরও আছে, জমি নিয়ে লড়াইয়ের কারণ দুটি অধিকার—একদিকে বেঁচে থাকার অধিকার, অপরদিকে সম্পত্তির অধিকার। বেঁচে থাকার অধিকার কেবল মূল নয়, সম্পত্তির অধিকারের চেয়ে অনেক উঁচুতে। বর্তমান অধিগ্রহণ আইনে কেবল আর্থিক (তিপূরণ দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু জমি হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও চলে যাচ্ছে। বনে বসবাস না করলেও আদিবাসীরা বনের সামাজিক সম্পদের অধিকারী। বনের কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে আদিবাসীরা জীবিকা করে। বনের ফলমূল তাদের খাদ্য। ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে বন-এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের নাম রেকর্ড করা না থাকলে তারা (তিপূরণের অধিকারী নয়। সামাজিক সম্পদ হিসাবে বনের ওপর আদিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত। নর্মদা ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে সর্দার সরোবর প্রকল্পে উৎখাত আদিবাসীদের বিকল্প জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা। কিন্তু গুজরাট সরকার সরকারি নথিতে নাম না থাকা আদিবাসীদের পুনর্বাসন দিতে অস্বীকার করেন অথচ মহারাষ্ট্রের মণিবেলী গ্রামে আদিবাসীরা ছয় পু(ষ বসবাস ও চাষবাস করছিল। কিন্তু সরকারি নথিতে তাদের নাম ছিল না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন জমি অধিগ্রহণ আইনে (তিগ্রস্ত মানুষদের তালিকার অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনেক আদিবাসী এলাকায় এবং অ(ণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুরে জমির মালিকানা গ্রামের। ফলে জলাধার, চওড়া সড়ক বা রেললাইনের কিংবা সরকারি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ করলে কাউকে (তিপূরণ দিতে হয় না। অ(ণাচল সরকার ১৯৯০ দশকে ৪০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রাঙ্গানদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে। (তিপূরণ বা পুনর্বাসনের জন্য বি(ে ভ সরকার কঠোর হাতে দমন করে। ঐ রাজ্যের বর্তমান কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ৩০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১ ল(৮০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের চুক্তি(করেছে। অ(ণাচল সিটিজেনস রাইটস তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জানতে পেরেছে যে, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য সরকার ১০৩টি প্রকল্পে এবং গত লোকসভা নির্বাচনের পাঁচ মাস আগে ৩১টি যৌথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সই করেছে এবং কয়েক কোটি টাকা অগ্রিম পেয়েছে। (দ্য স্টেটসম্যান, ২ সেপ্টেম্বর, ০৯) । এই সব প্রকল্পে উৎখাত ব্যক্তি(দের (তিপূরণ দিতে হবে না, তাই তাদের পুনর্বাসনের প্র(উঠছে না। অ(ণাচলে না হয় অন্যত্র গিয়ে নতুন গ্রাম গড়বে। কিন্তু মণিপুরে সে সুযোগও নেই। পাহাড়ে থাকে নাগা-কুকিরা, সমতলের বাসিন্দা বৈষ(ব ধর্মাবলম্বী মেতেইদের পাহাড়ে জমি কেনার অধিকার নেই। ভারত সরকারের প্রস্তাবিত চার/ছয়/আট লেনের বার্মা-মুখী সড়ক এবং তেপাইমুখী ড্যামের জন্য জমি হারাবে সমতলের মেতেইরা। তাঁরা (তিপূরণ বা পুনর্বাসন কোনোটাই পাবেন না। ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে এই জটিল সমস্যা সমাধানের কোনো সুযোগ নেই।

আইনের ১৭ ধারা ও ১১ ধারা বাতিল না করলে জ(রি প্রয়োজন দেখিয়ে কম টাকায় সড়ক, বিমানবন্দর, বি(েবিদ্যালয়, উপনগরীর নাম করে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। 'সেজ' প্রকল্পে কৃষিজমি অধিগ্রহণে বাধা পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উৎখাত ব্যক্তি(দের পুনর্বাসনের জন্য আইনের সংশোধনে উদ্যোগী হয়েছে। ঐ বিলে বেসরকারি উদ্যোগপতিরা ৭০ শতাংশ জমি কৃষকদের নিকট থেকে কিনলে সরকার অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে দেবে। তৃণমূল কংগ্রেস সঙ্গতভাবে আপত্তি তুলেছে, সরকার বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করবে কেন? তপসিয়ার চামড়া-শিল্প, গার্ডেনরীচ ও মহেশতলা সন্তোষপুরের পোশাক-শিল্পের জন্য তো সরকার কোনো জমি অধিগ্রহণ করে নি। কিন্তু সমস্যা কেবল শিল্পের প্রয়োজনে কৃষিজমি অধিগ্রহণের নয়, সড়ক, বিমানবন্দর, উপনগরী, সরকারি আবাসন তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বা উৎখাত ব্যক্তি(দের পুনর্বাসনের জন্য ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধনের ব্যাপারে সরকার ভাবছে বলে মনে হয় না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতে ও বহুদেশে কোনো প্রকল্পে উৎখাত ব্যক্তি(দের পুনর্বাসনের আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছে, বি(েব্যাঙ্কের ঋণদান নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু শহর উন্নয়নের জমি অধিগ্রহণ আইনের বিরোধিতা কলকাতা শহরেই হয়েছে ১৯৬১ সালে। লবণহ্রদ এলাকা ভরাটের আগে ঐ বিল এলাকায় বসবাস করতেন তপসিলি সম্প্রদায়ের কৃষক ও মৎস্যজীবীরা। দুটি সংগঠন সরকারি নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু সংবাদপত্রে কোনো খবর হয় না। প্রয়াত শক্তি(সরকার ও প্রেমতোষ ঘোষ পরিচালিত সংগঠন উৎখাত ব্যক্তি(দের পুনর্বাসনের দাবিতে লবণ-হ্রদ প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৬১ সালে উৎখাত মৎস্যজীবী ও কৃষকদের মীনাখাঁ এলাকায় পুনর্বাসনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীরা ঐ প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে উদ্যোগী হন নি। উৎখাত ব্যক্তি(দের বংশধরেরা এখন দত্তাবাদ-বস্তির বাসিন্দা। তাদের সল্টলেক উপনগরীতে পুনর্বাসনের কোনো চেষ্টা হয় নি। কসবার পূর্বে ইস্ট ক্যালকাটা টাউনশিপ পরিকল্পনা হয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে। বি(েব্যাঙ্ক উৎখাত গরিবদের পুনর্বাসনের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর শহর-উন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর ঐ টাকা অন্যভাবে খরচ করেন এবং জমি অধিকার আইনের ১৭ এবং ১১ ধারা প্রয়োগ করে এলাকা দখল করেন। কিন্তু জমি থেকে উৎখাত ব্যক্তি(রা এলাকায় সন্ত্রাসের জন্য সরকারের বি(দ্ধে আন্দোলন করতে পারে নি। তাই এখনও অনেকে পুনর্বাসনের সুযোগ পায় নি।

সহায়ক গ্রন্থ

(১) Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Twenty Nineth Report (1987-89), Government of India.

(২) John K. Galbraith : The Nature of Mass Poverty. Harvard University Press, 1979.

(৩) Lady Hope : General Sir Arthur Cotton. Institute of Engineers (India) 1964.

(৪) প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—জমি আধিগ্রহণ। দৈনিক বর্তমান ৬/৯/২০০৯।

(৫) UN Human Rights Commission Forced Eviction And Human Rights, Fact sheet No. 25.

বিজ্ঞানের দৌলতে বুড়োর দল বাড়ছে, বাড়ছে ব্যক্তি-সামাজিক সমস্যাও

অমিত সরকার

বাংলায় প্রবাদ আছে 'বাড়ির বালাই বুড়ি, পেটের বালাই মুড়ি'। বুড়ো-বুড়িদের সমাজে দুর্দশার অন্ত নেই। যৌথ পরিবার নেই। এখন বাবা-মা ছেলে/ মেয়ে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। ছেলে কর্মসূত্রে বা স্ত্রীসূত্রে অন্যত্র থাকে। বুড়ো-বুড়িদের জ্বালা তাই বাড়ছে। জুটি ভাঙলে তো কথাই নেই! ইংরেজি ছবিতে দেখা যায় বিদেশে রাস্তাঘাটে কেমনভাবে বয়স্কদের নিগ্রহ করছে ছেলে ছোকরারা। এখানে অবস্থাটা প্রায় সেদিকেই যাচ্ছে। বাসে উঠতে-নামতে দেরির জন্য কন্ডাক্টর ও যাত্রীদের মুখ-ঝামটা শুনতে হয়। বিজ্ঞানের দৌলতে আয়ু বাড়ছে, বাড়ছে প্রবীণদের সংখ্যা, সেই সঙ্গে ব্যক্তি-সামাজিক সমস্যাও।

বার্ধক্য পরিসংখ্যানে

আধুনিক চিকিৎসার সুফলে মৃত্যু বিলম্বিত হয়েছে। মানুষ ক্রমশ মৃত্যুকে অবহেলা করতে শিখেছে। বাইবেলে কথিত আছে মানুষ বাঁচে তিন কুড়ি দশ বছর, বেশি বাঁচলে চার কুড়ি বছর। কয়েক দশক আগেও মনে হত এসব কল্পকথা। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের হুনজায়, জর্জিয়ার আবখাজিয়া অঞ্চলে কিংবা ইকুয়েডরের ভিলকাবমবাতে মানুষেরা ১১০ থেকে ১২০ বছর বেঁচে থাকে, এসব আজ আর সাধারণজ্ঞানের বিষয় নয়। মানুষ আজ বেশিদিন বাঁচছে। পশ্চিমীদেশে যা শুরু হয়েছিল দু-চার দশক আগেই, এখন তা সত্যি হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও। আমেরিকায় ১০০ বছরের বেশি বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা ২০৩০ সালে দাঁড়াবে ৫০ লক্ষ। ভারতের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সালে গড় আয়ু ছিল ৩০ বছর, ১৯৭০-৭৫-এ তা ৫৩.৫ বছর, বর্তমানে ৬৫-রও বেশি। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যার ৬.৫৫ শতাংশ। প্রবীণ মানুষ ছিলেন ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৭ শতাংশ। ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াবে ৯ থেকে ১৩ শতাংশের মধ্যে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জন্মহার কমলেও মৃত্যুহার কমেছে তার চেয়ে বেশি। ১৯৮০ সালে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে ৩৩.৭ ও ১২.৬, ২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৫.৮ ও ৮.৫-এ, জনসমাজের বয়োবৃদ্ধি হচ্ছে, শিশুর তুলনায় বয়স্ক মানুষজনের সংখ্যা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসমষ্টির শারীরিক, সামাজিক, মানসিক নানা সমস্যা নতুন এক সঙ্কটের জন্ম দিচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে।

বার্ধক্য কী

কোনো একটি নির্দিষ্ট উপসর্গ কিংবা তার প্রকাশের ধরণন দিয়ে বার্ধক্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। চর্বি কোষকলার নষ্ট হওয়ার কারণে ত্বকে খাঁজ পড়া, জৈবরঞ্জক মেলানিনের হ্রাসে চুল সাদা হওয়া, রক্তচাপ কিংবা কোলেস্টোরলের মাত্রা বৃদ্ধিতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা, ইনসুলিন তৈরি হওয়া বা তার কার্যকর মাত্রা কমে যাওয়ায় রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে ডায়াবেটিস হওয়া, চোখের অভ্যন্তরে জলীয় পদার্থ কমে যাওয়ার কারণে গ্লুকোমায় আক্রান্ত হওয়া, এমনকি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়া, প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতায় নানা রোগের সংক্রমণ, হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা, পেশীর ক্ষয়ে শারীরিক দুর্বলতা, স্নায়ুকোষের ক্রিয়াশীলতা কমে যাওয়ায় চিন্তভ্রংশ ও বুদ্ধি লোপ পাওয়া, অ্যালঝাইমার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তি ও অপর কাউকে চিনতে পারার বা কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা লোপ পাওয়া—এই সবই বয়স্ক মানুষের সাধারণ সমস্যা। এমনকি ক্যানসার রোগকেও বার্ধক্যের অসুখ বলা হয়ে থাকে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে হার্টের পাম্প ক্ষমতা, রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা, মস্তিষ্ক ও কিডনিতে রক্ত সরবরাহ, মজ্জা থেকে রক্তকোষ তৈরি হওয়া, কিডনি নালিকা বা স্বাদ কোষের সংখ্যা কমে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক পরিবর্তন যেমন আসে, পাশাপাশি কোষের অভ্যন্তরীণ যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা হল—ক্রোমোজমের ত্রুটি, প্রোটিন তৈরির মাত্রা কমে যাওয়া কিংবা ত্রুটিযুক্ত প্রোটিন তৈরি হওয়া, সাইটোপ্লাজমের জলের পরিমাণ কমায় ক্রোমাটিনের ঘনীভবন, চর্বিকোষের জারণের ফলে 'লাইপোফাসিন' রঞ্জক বেশি জমা হওয়া, থাইরয়েড, গোনাড, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, অ্যাড্রিনাল মেডুলার কার্য মতা কমে যাওয়া। কোনো কোনো সময় বার্ধক্য ও রোগ সমার্থক হয়ে ওঠে। শারীরবৃত্তীয় একমুখিন নানা পরিবর্তনই হল বার্ধক্য, যা অনেক সময়ই রোগের কারণে হয়ে থাকে।

বার্ধক্য নানা মত

বিজ্ঞান মতে বার্ধক্য কেন আসে এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দু হাজার বছর আগে অ্যারস্টিটল মনে করতেন শরীরের তাপ কমে যাওয়ার ফলে বার্ধক্য আসে। জীববিজ্ঞান গবেষণায় প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, তাতেই পাল্টে গেছে বার্ধক্যসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা। ১৯০৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রাব্নার প্রথম বার্ধক্য সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত প্রকাশ করেন। তিনি সাব্যস্ত দিয়ে প্রমাণ করেন শরীরের অভ্যন্তরে বিপাকীয় মাত্রাই বার্ধক্য নির্ধারণ করে। ১৯২৮ সালে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী পার্লের মতে জীবনের সময়কাল শক্তি খরচের মাত্রার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। ১৯৫৯ সালে হাঙ্গেরির বিজ্ঞানী লিও সিজিলার্ড বলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জিনের পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ত্রুটিযুক্ত প্রতিলিপি তৈরি হয় যা শারীরবৃত্তীয় স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটায়। যদিও এই মতবাদ স্থায়ী হয়নি, কেননা বাস্তবিক ক্ষেত্রে যে হারে জিনের পরিবর্তন ঘটে, তার চাইতে ত্রুটি সংশোধনের হার অনেক বেশি হওয়ায় ওই বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা

প্রায় থাকেই না। সমসময়ে অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী বারনেট ইমিউনো-ব্যবস্থা দিয়ে বার্ধক্যের ব্যাখ্যা করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থাইমাস, যা টি কোষের কর্ম(মতার জন্য দায়ী, তার সত্রি(য়তা হারায়, ফলে নানান রোগ ভিড় করে। ১৯৬৮ সালে জন জর্কস্টেনের মতে গঠনগত প্রোটিনসমূহ অন্য প্রোটিনদের সঙ্গে অন্তঃ ও আন্তঃ বন্ধন তৈরি করে আর এই ধরনের বন্ধনই বার্ধক্যের কারণ। ১৯৮৩ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির দিলম্যান অন্য এক ধারণার জন্ম দেন(পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে তিনি তা ওয়ার্ড জিনের সঙ্গে সংশোধিত করে বলেন, বয়স বাড়ার ফলে রিসেপ্টারের সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় যা দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতিকে নষ্ট করে, হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন ঘটায় ও বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।

সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মতের প্রবক্ত(া বিজ্ঞানী হারম্যানের মতে শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া মুক্ত(আয়নসমূহই (ফ্রি র‍্যাডিক্যালস) বার্ধক্যের জন্য দায়ী। সুপার অক্সাইড, হাইড্রোক্সিল, হাইড্রো-পারঅক্সিল, অ্যালকক্সিল, পারঅক্সিল, নাইট্রিক অক্সাইড র‍্যাডিক্যাল ইত্যাদি ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ছাড়াও অক্সিজেন, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড অণু ইত্যাদি সত্রি(য় অক্সিজেন আয়ন (রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পেসিজ অর অক্সিডেন্ট) শরীরের নানা জৈব-রাসায়নিক ত্রি(য়ায় তৈরি হয়(পরিবেশ দূষণ বা ধূমপানের মতো অভ্যাস এই তৈরিকে ত্বরান্বিত করে। এই ধরনের ফ্রি র‍্যাডিক্যাল জমা হওয়ার ফলে কোষের অভ্যন্তরে 'অক্সিডেটিক স্ট্রেস' তৈরি হয় তা প্রতিহত করার জন্য 'অ্যান্টি অক্সিডেন্ট' নামক প্রতিরোধী ব্যবস্থাও আমাদের শরীরে রয়েছে যা বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগ যেমন অ্যালমাইমার, পারকিনসন্স, বাত, কার্ডিওভাসক্যুলার রোগ ও ক্যানসার থেকে শরীরকে র(া করে। ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন সি(সুপার অক্সাইড ডিস্‌মিউটেজ, গ্লুটাথায়ন পার অক্সিডেজ, গ্লুটাথায়ন-এস-ট্রান্সফারেজ, ক্যাটালেজ প্রভৃতি উৎসেচক এবং গ্লুটাথায়ন, কো এনজাইজ-কিউ, মেলাটোনিন ইত্যাদি একযোগে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসৃত হয় যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালকে অপসারিত করে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে এই হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের পরিমাণ ত্র(মশ বৃদ্ধি পায়, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে(কোষ (তিগ্রস্ত হয়, বার্ধক্য আসে।

অন্যান্য কোষের থেকে গঠন ও কাজের ধরনে স্নায়ুকোষ একদম আলাদা। এই সকল কোষের কোনো প্রতিলিপি তৈরি হয় না ফলে ডি এন এ মেরামতি (মতা বার্ধক্যের সাঙ্গে সাঙ্গে কমে এলে স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়।

ত্রে(োমোজমের প্রান্তে টেলোমিয়ার বর্তমান, যা ডি এন এ বেস-জোড়া দিয়ে তৈরি। মিউটেশানের ফলে টেলোমিয়ার (য় প্রাপ্ত হয়, বেশি মাত্রায় (য় প্রাপ্ত হলে কোষ তার বিভাজন (মতা হারায়। বয়স্ক লোকেদের টেলোমিয়ারে একজন শিশু বা যুবকের থেকে অনেক কম বেস-জোড়া থাকে। সে কারণে টেলোমিয়ারকে 'টাইমার অফ মর্টালিটি' বলে।

আমাদের শরীরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগের পেছনে কোষের মৃত্যু 'অ্যাপপটোসিস', যা আসলে 'প্রোগ্রাম্‌ড সেল ডেথ'-এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিম্বাণুর অ্যাপপটোসিসের ফলে মহিলাদের মেনোপজ আসে। মস্তিষ্ক কোষের অ্যাপপটোসিসের ফলে স্মৃতিশক্তি(হ্রাস পায় বা অ্যালঝাইমার রোগের প্রকাশ ঘটে। ত্বককোষের অ্যাপপটোসিসের ফলে ত্বক তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়। আর এই অ্যাপপটোসিস প্রত্রি(য়া উদ্দীপিত হয় রশ্মি বিকিরণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা জারক দ্রব্য দ্বারা।

বার্ধক্যের সঙ্গে বিভিন্ন হরমোন বিশেষত সেক্স হরমোন, গ্রোথ হরমোন, মেলাটোনিনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অ্যড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হরমোন ডি এইচ ই এ (ডিহাইড্রোঅ্যান্ড্রোস্টেরন)বার্ধক্য আসার ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখা গেছে, ডি এইচ ই এ-র মাত্রা কুড়ি বছরে সবচেয়ে বেশি, তিরিশ বছরের পর থেকে তা কমতে থাকে, আশি বছর বয়সে এর মাত্রা দাঁড়ায় এক পঞ্চমাংশ। প্রসঙ্গত ডি এইচ ই এ বার্ধক্যের বি(দ্ধে চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বার্ধক্যের মূলে রয়েছে জিন। কৃমি জাতীয় প্রাণী সেনরহ্যাবডিটিস এলিগ্যান্‌স্ কিংবা ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার মাছির ে ত্রে এই সত্য আজ বিজ্ঞান সমর্থিত। বর্তমানে শতাধিক জিনের সন্ধান মিলেছে যাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃমিজাতীয় প্রাণী, ইস্ট, মাছি, ইঁদুরের জীবনকাল বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে এই ধরনের প্রাণীর ে ত্রে জিনের যে পরিবর্তন বার্ধক্য দেরিতে আনে, তা মানুষের ে ত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত অনেক অ্যান্টি ক্যান্সার ওষুধ ইঁদুরের ে ত্রে কার্যকর হলেও মানুষের ে ত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

পরিবেশগত, গোষ্ঠীগত বিভিন্ন কারণ ও অভ্যাস অকাল বার্ধক্যের জন্য দায়ী। সমী(য় দেখা গেছে আমেরিকায় বসবাসকারী জাপানিদের চাইতে জাপানে বসবাসকারী জাপানিদের বার্ধক্য আগে আসে এবং বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা যেমন কোলেস্টেরলের মাত্রা কিংবা হার্টের অসুখ বেশি হয়।

বার্ধক্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা

যে সকল সমস্যা প্রবীণ লোকেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপন্নতা ডেকে আনে তা হল

· শারীরিক দুর্বলতা · রোগজনিত সমস্যা · অর্থনৈতিক অসুবিধা · কর্মহীনতা · বন্ধু পরিজনের ওপর নির্ভরশীলতা · নিঃসঙ্গতা · মানসিক অবসাদ · মৃত্যুচেতনা।

এই সব সমস্যাই যে সবার মধ্যে দেখা দেবে তেমন নয়, তার পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, জীবনবোধ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, চারিত্রিক ও মানসিক গঠন এ ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সকল সমস্যার সঙ্গে যুক্ত(হয়ে পড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষ কিছু বিষয়। এই দেশগুলোতে জনসংখ্যার প্যাটার্ন, সমাজের গঠন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে(ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে ৮ কোটিরও বেশি মানুষ প্রবীণ, যার ৩০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, ৩৩ শতাংশের অবস্থান দারিদ্র্যসীমা ছুঁয়ে(৯০ শতাংশ প্রবীণ মানুষ এসেছেন অসংগঠিত ে ত্র থেকে যাঁদের সেই অর্থে কোনো সামাজিক সুর(া নেই(৬০ বছরের ওপরের ৫৫ শতাংশ মহিলা বিধবা।

বি(্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা তৃতীয় বি(্বের দেশগুলোতে প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দেশগুলোর শ্রম-বাজারের চরিত্র গেছে পাল্টে। বয়স্ক জনসমষ্টি বাড়ছে অথচ তারা এই বাজার থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে। তা ঘটছে সংগঠিত ে ত্রে স্বেচ্ছাবসর ইত্যাদির কারণে, অসংগঠিত শিল্প(ত্রে ও গ্রামীণ ে ত্রে কর্মহীনতার কারণে। 'উন্নয়ন'-এর অনিবার্য কারণে কাজের খোঁজে যে জনসমষ্টি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বাস্তুচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তারা মূলত অল্পবয়সী। বয়স্ক জনসমষ্টি পুরোনো বাসস্থান, সংস্কার ইত্যাদি আগলে পড়ে থাকছে আগের অবস্থাতেই, তার ফলে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া জাতীয়

বা আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা লেগেই রয়েছে, যাতে সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়ে প্রবীণ মানুষজন।

মহিলারা এমনিতেই সমাজে অবহেলিতা, তার ওপর বয়স্কা ও বিধবা হলে তাদের নিরাপত্তাহীনতা, দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সমাজবিজ্ঞানী ইন্দিরা জয়প্রকাশের মতে মহিলাদের বৈধব্য তাঁদের 'সামাজিক মৃত্যু' ঘটায় কেন না তাঁদের পরিধান, খাদ্যাভ্যাস, আচরণবিধি সব কিছুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে যা তাঁকে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত(হওয়া আর্থিক সংকট তাদের বার্ধক্য ও মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে কোনো সময়ই তাদের স্বাধীন অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি তৈরি হতে পারে না। তার ওপর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক সময়ই সুস্থিত সরকার থাকে না। ফলে দীর্ঘমেয়াদি কোনো স্বাস্থ্যনীতি, পরিকল্পনা তৈরি হয় না, যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে। সার্বিকভাবে জাতীয় আয়ের খুব কম অংশই ব্যয়িত হয় স্বাস্থ্যখাতে। জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৯ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতে, যা ত্র(মশ কমছে(কয়েক বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল ১.৩ শতাংশ। স্বাভাবিক কারণেই সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত এই ত্র(মবর্ধমান প্রবীণ জনসমষ্টির বিষয়ে উদাসীন থাকে রাষ্ট্র ও সরকার। ফলে এই জনসমষ্টি ত্র(মশ পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক হয়ে পড়ে। মানসিক, অর্থনৈতিক, আবেগজনিত অবহেলা, দুর্ব্যবহার তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ নিগ্রহ বর্তমানে বয়স্ক লোকেদের চিকিৎসার এক গু(ত্বপূর্ণ বিষয়।

বৃদ্ধ নিগ্রহ

বি(স্বাস্থ্য সংস্থা ও 'ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর দ্য প্রিভেনশন অভ এল্ডার অ্যাবিউজ' কতকগুলো দেশেকে চিহ্নি(ত করে বৃদ্ধনিগ্রহের ওপর সমী(া, গবেষণার ওপর জোর দিয়েছে। দেশগুলো হল কেনিয়া, লেবানন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং আমাদের ভারত। কেন না চিকিৎসক, এপিডেমিওলজিস্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা গবেষকের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত বৃদ্ধনিগ্রহ এক সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যা। যে সকল কারণে বৃদ্ধ নিগ্রহ হয়ে থাকে তা হল

· এক সঙ্গে থাকার কারণে নিগ্রহের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, মতামতের সঙ্ঘাত এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাই নিগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। সমী(ায় দেখা গেছে একা থাকলে নিগ্রহের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কমে।

· চিত্তভ্রংশ (ডিমেনসিয়া) রোগগ্রস্ত বয়স্ক লোকেরা অনেক ে(ত্রেই শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন। এই ধরনের বয়স্কদের আচরণে অসঙ্গ তি দেখা যায়, অনেক সময়ই তাঁরা বদমেজাজি হন। তাঁদের আচরণে পরিচর্যাকারীরা অত্যন্ত বিরক্ত(থাকে, যা তাদেরকে প্রতিশোধস্পৃহ করে তোলে। আবার অনেক সময় পরিচর্যাকারীরা পরিবারেরই কোনো বয়স্কজন হয়ে থাকেন, তাঁরা আবার অন্য দিক থেকে রোগগ্রস্ত মানুষটি দ্বারা প্রায়শই নিগৃহীত হন।

· সামাজিক দিক থেকে, বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তাঁর অবস্থান পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে, যা নিগ্রহের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

· অবসাদগ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা বৃদ্ধজনের ওপর অপে(াকৃত বেশি নিগ্রহ ঘটিয়ে থাকে।

বেশির ভাগ ে(ত্রেই সেই সমস্ত লোকজনেরাই নিগ্রহ ঘটিয়ে থাকে যারা তার ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে কিংবা সম্পত্তিগতভাবে নির্ভরশীল।

এমনই সব কারণে বৃদ্ধনিগ্রহ সঙ্ঘটিত হয়। সমস্যা হল নিগ্রহের কারণে অসুস্থতার মাত্রা নির্ধারণ করা ও উপযুক্ত(চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। আসলে চিকিৎসকদের কাছে বৃদ্ধনিগ্রহ সমাজগত এক প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাঁরা প্রথাগত জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে এই সমস্যাকে শারীরিক ও রোগজনিত সমস্যা হিসাবে দেখেন, আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা না করার ফলে প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় না। প্রচলিত চিকিৎসা ধারায় রোগ প্রতিকারে রোগ-বাছাই, রোগ নির্ণয়, রোগ চিকিৎসা যথাত্র(মে করা হয়ে থাকে। যেমন ক্যানসারের ে(ত্রে চিকিৎসা শু(ই হবে না যদি না তা বায়োপসি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। বৃদ্ধ নিগ্রহের ে(ত্রে এমনটি সম্ভব নয়, আর সে কারণেই সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংগঠন এর বাছাই, মূল্যায়ন ও যথাযথ চিকিৎসা সংত্র(ান্ত সমী(া ও গবেষণার ওপর বিশেষ গু(ত্ব দিয়েছে।

বার্ধক্যের চিকিৎসা

সাধারণভাবে চিকিৎসকেরা বয়স্ক মানুষজনের সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে ভেবে থাকেন ও চিকিৎসা করে থাকেন, ফলে চিকিৎসার সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায় না। একজন চিকিৎসক যদি সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই সকল সমস্যাকে অনুধাবন করে চিকিৎসা করেন তবে অবশ্যই আশাজনক ফল পাবেন। বয়স্ক জনসমষ্টির সংখ্যা যে পরিমাণ বাড়ছে, তাদের অসুস্থতা, ভাল থাকা-মন্দ থাকা বিষয়গুলো যেভাবে গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা একজন সাধারণ চিকিৎসকের প(মোকাবিলা করা প্রায়শই অসম্ভব হয়ে উঠছে। স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের মতো বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে বিষয়গুলোর ওপর বার্ধক্য চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাকে গু(ত্ব দিতে হবে তা হল

· বয়স্ক লোকেদের স(ম জীবনে পরিচালিত করা।

· রোগের পূর্ব নির্ধারণ ও সঠিক উপযুক্ত(চিকিৎসা করা।

· বৃদ্ধ নিগ্রহকে নির্ধারণ, সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা।

· পঙ্গু হওয়ার ফলে কিংবা রোগে ভোগার কারণে যে কষ্ট হয় তা লাঘব করা।

· মানসিক সহায়তা দেওয়া, ধৈর্য দিয়ে তাদের কথা শোনা, তাদের স্বায়ত্তকে স্বীকার করা।

· অবসাদ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি মানসিক অসুস্থতাকে গু(ত্ব দিয়ে ভাবা, এর ফলে আত্মহানি প্রবণতা থাকলে আগে থাকতে সতর্ক হওয়া।

· জীবনের গুণগত মান বাড়ানোর ল(্যে সহানুভূতিশীল চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা।

· খাদ্য ও পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া।

· পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বৃদ্ধাশ্রম' বা ওই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে থাকতে বাধ্য হলে যে মানসিক অসুবিধা তৈরি হয় তা বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে অনুধাবন করা।

· নিরাময় চিকিৎসার পাশাপাশি উপশমকারী চিকিৎসার ওপর গু(ত্ব দেওয়া, বিশেষ করে জীবনের অন্তিম অবস্থায়।

এখনও সমাজ যদি এই বিপুলসংখ্যক বয়স্ক জনসমষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকে, অদূর ভবিষ্যতে অনৈতিক, অমানবিক এক সামাজিক সঙ্কট উপস্থিত হবে, যা সামলানো বেশ কষ্টকরই হয়ে উঠবে।

WITH THE COMPLIMENTS OF :~

M/s.
PURULIA METAL CASTINGS PVT. LTD.

MFG. OF TMT BAR

REGD. OFFICE :
1, BRITISH INDIA STREET (7th FLOOR), KOLKATA - 700069

FACTORY :
BARAKAR ROAD, VIVEKANANDA NAGAR, PURULIA - 723101